দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির বিষয়বৈচিত্র্য

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলা উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির বিষয়বৈচিত্র্য

বাংলা উপন্যাসের বিষয়ের বৈচিত্র্য অদ্যাবধি পাঠককে বিস্মিত এবং বিমুগ্ধ করেছে। ব্যাপ্ত পরিসরের অবকাশে উপন্যাসে বৈচিত্র্যের অভিক্ষেপ প্রায়শই বেশি থাকে। স্থান-কাল-পাত্রের রকমভেদ বিষয় ভাবনাতেও বৈচিত্র্য আনে। শুধু তাই নয়, এক-একজন ঔপন্যাসিকের জীবনকে এক এক রকমভাবে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গিও উপন্যাসের বিষয়ের বৈচিত্র্যে মাত্রা এনে দেয়। আপাতভাবে এটা সাধারণ একটি বিষয়। তবুও বাঙালি পাঠকের তালিকায় দীর্ঘদিনের উপন্যাসের যাত্রাপথে এই বিষয়-বৈচিত্র্যই কোথাও না কোথাও পাঠকের একনিষ্ঠ আকর্ষণকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। কেননা বিষয়ের পুনরাবৃত্তি কখনোই পাঠকের আগ্রহকে ধরে রাখতে সমর্থ নয়। তাছাড়া বিষয় যদিও মোটা দাগে একমাত্রিক হয়, যেমন— ইতিহাস যদি উপন্যাসের বিষয় হয়, তবে ঔপন্যাসিক যুগরুচি এবং চাহিদাকে মাথায় রেখে ইতিহাসের যে কালকে নির্বাচন করেন, যে চরিত্রদের নির্মাণ করেন, যে ঘটনা-আবহ পরিবেশ তৈরি করেন, তাতে তাঁর লেখনী প্রতিভার দিকটিও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী', 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে পরিচিত হয়। আবার রমেশচন্দ্র দত্তের নামাঙ্কিত হয়ে থাকে 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'।

বর্তমান অধ্যায়ে গবেষণার জন্য নির্বাচিত উপন্যাসগুলির বিষয়-বৈচিত্র্যের নিরিখে উপন্যাসিকদের স্বকীয়তার জায়গাটি পরিস্ফুট করে তোলবার অবকাশ রয়েছে। এছাড়াও এই বিশেষ নির্বাচিত উপন্যাসগুলিতে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির

বিষয় বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। লোকসংস্কৃতিনির্ভর উপন্যাসগুলি রচনা করা হয়ে থাকে, সেগুলি যে একটা বিশেষ ভৌগোলিক সীমানা নির্ভর হবে সেটাই স্বাভাবিক। সেই বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের নির্দিষ্টতায় যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তা অন্য সংস্কৃতি থেকে অঞ্চলভেদে পৃথক হবে এটাও বাস্তবিক। তাই সংস্কৃতির ভিন্নতায় আচার, বিচার, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার আলাদা হবে এবং বদলে যাবে বাক্‌বিন্যাস, বদলে যাবে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি। তাই বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির বিষয়ের বৈচিত্র্য বিন্যাসও বহুমাত্রিকতায় ধরা দেয়। তবে বলা বাহুল্য, শুধু বিষয়ের বৈচিত্র্যগত দিক থেকেই নয়, এর নান্দনিক দিকটিও অনস্বীকার্য। কোথায়, কীভাবে উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির বিষয়-বৈচিত্র্য ও নান্দনিকতা প্রকাশ পেয়েছে, তা নির্বাচিত উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণে তুলে ধরা হবে।

রুক্ষ মাটির মানুষের যিনি ছিলেন রূপকার, তিনি রবীন্দ্রত্তোর যুগের অন্যতম কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়দেশের এক বিচিত্র পরিবেশে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশে জন্ম হয় এই কথাশিল্পীর। তাঁর রচিত অন্যতম একটি উপন্যাস ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’।

এই ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’তে বর্ণিত হয়েছে বেদে সম্প্রদায়ের জীবনচর্চা ও চর্যা। উপন্যাসটিতে হিজলবিলের বিষবেদে সম্প্রদায়ের জীবন কথা রূপায়িত হয়েছে। সেই সমস্ত মানুষ একালের হয়েও প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবিচ্ছেদ্য নিয়ন্ত্রণে বাঁধা। তাদের জীবনাচার, মূল্যবোধ, অনুভূতি, বুদ্ধি ইত্যাদি পরিচালিত হয় দৈব ও অলৌকিক বিশ্বাসের অনুশাসনে, যুক্তিহীন সংস্কারাচ্ছন্নতার মধ্যে। ঔপন্যাসিক বরাবর নিম্নসম্প্রদায় শ্রেণির মানুষদের নিয়ে লেখালেখি করেছেন।

ডোম-বাগদি-কাহার-বেদে-মুচি প্রভৃতি শ্রেণির মানুষ হয়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসের চরিত্র।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' হিজলের তীরে বসবাসকারী বিষবেদেদের লৌকিক ইতিকথা। এই উপন্যাসে নানা পুরাকথা বা মিথ এবং সাপ সম্পর্কিত নানা মন্ত্রমূলক ছড়া, গান রচিত হয়েছে। বেদে সম্প্রদায়ের যাদুবিদ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই উপন্যাসে।

ঔপন্যাসিক ভাগীরথী তীরবর্তী সর্প-অধ্যুষিত হিজল বিলকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের জাল বিস্তার করেছেন এবং সেই অঞ্চলের আদিবাসী বেদে সমাজকে তার কুশীলব হিসেবে বেছে নিয়েছেন। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে হিজল বিলের বর্ণনা দিয়ে। এই হিজল বিলের সুগন্ধি আশেপাশের মানুষের প্রাণ ভরিয়ে দেয়। মাঝিরা যদিও এই সুগন্ধিতে অভ্যস্থ। কিন্তু নৌকার আরোহীরা সুগন্ধির কারণ জানতে পারে না। মাঝিরা তাদের সেই সুগন্ধির উৎস নির্দেশ করে দেয় এবং মাঝি সেই সঙ্গে 'গগন-ভেরী' পাখি সম্পর্কে ধর্মীয় মিথ উপস্থাপন করে।

ঔপন্যাসিক এই হিজল বিলকে 'যমরাজের দক্ষিণ দুয়ার' বলে চিহ্নিত করেছেন— 'হিজলের ঘাসবনে, জলতলে মৃত্যুর বসতই বটে'। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য উপন্যাসকে মধ্যযুগের 'মনসামঙ্গল'-এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন এবং 'মনসামঙ্গল' কাহিনির নবনির্মাণ করেছেন—

"হিজল বিলে মা-মনসার আটন। পদ্মাবতী হিজল বনের পদ্ম-শালুকের বনে বাসা বেঁধে আছেন। চাঁদো বেনের সাত ডিঙা মধুকর সমুদ্রের বুকে ঝড়ে ডুবিয়ে এইখানে এনে লুকিয়ে রেখেছিলেন। বৃন্দাবনের কালীদহের কালীনাগ কালো ঠাকুরের দণ্ড মাথায় ক'রে কালীদহ ছেড়ে

এসে এখানেই বাসা বেঁধেছে। কালীনাগ বলেছিল— তুমি তো আমাকে দণ্ড দিয়ে এখান থেকে নির্বাসন দিলে; কিন্তু আমি যাব কোথায় বলো ? ঠাকুর বলেছিলেন—ভাগীরথীর তীরে হিজল বিল, সেখানে মানুষের বাস নাই, সেখানে যাও।"[১]

এই উদ্ধৃতিতে কালীদহের কালনাগিনির কথা যেমন এসেছে, তেমনি 'চাদো বেনে'র কথাও সমানভাবে এসেছে। তাই সমালোচক গুণময় মান্না বলেন—

"সাপ এবং সাপুড়ে বেদেদের ভালো করেই চিনতেন তারাশঙ্কর, সেই অভিজ্ঞতার জিনিসের সঙ্গে তিনি মিলিয়েছেন মনসামঙ্গলের পুর্নগঠিত মীথ বা দেবকথাকে। পুনগর্ঠিত বলছি এই জন্য যে, মধুসূদন যেমন রাম কথাকে নতুন করে সাজিয়েছিলেন, তারাশঙ্করও তেমনই কালপোযোগী করে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর পুনর্বিন্যাস করেছেন—এবং বেশ ভালো ভাবেই করেছেন।"[২]

উপন্যাসের কাহিনি তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত। উপন্যাসের গোটা কাহিনিটি বিষাদময়তায় গাথা। প্রথম পর্যায়ে পুরাণের দেব-দেবী বা মিথের কাহিনি পরিবেশন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিরবেদে, মহাদেব এবং নাগিনি কন্যা শবলার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ে আছে শিরবেদে গঙ্গারাম ও নতুন নাগিনি কন্যা পিঙলার বিষাদময় চিত্র। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে নাগিনি কন্যাদের করুণ কাহিনি বর্ণনাই ঔপন্যাসিকের মূল অভিপ্রায়। কিন্তু সেই অভিপ্রায়কে পূর্ণ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লোকসংস্কৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। লোকচর্যাকে করেছেন উপকরণ। উপন্যাসটি বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্যতম আধার হয়ে উঠেছে যেন। উপন্যাসে মনসার স্বরূপ অঙ্কন করেছেন এইরকমভাবে—

"মা মনসার ব্রতকথায় মর্ত্যের মেয়ে বেনে-বেটী মায়ের দক্ষিণমুখী যে মূর্তি দেখেছিল—সেই মূর্তি মনে প'ড়ে যাবে। মা বলেছিলেন বেনের—'সব দিক পানে তাকিয়ো, শুধু দক্ষিণ দিক পানে তাকিয়ো না'। বেনের মেয়ে নাগলোক থেকে মর্ত্যধামে আসবার আগে দক্ষিণ দিকের দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারে নি। তাকিয়ে দেখেই সে ঢ'লে প'ড়ে গিয়েছিল। মা-মনসা বিষহরির ভয়ঙ্করী মূর্তিতে দক্ষিণ দিকে মৃত্যুপুরীর অন্ধকার তোরণের সামনে অজগরের কুণ্ডলীর পদ্মাসনে বসেছেন—পরনে তাঁর রক্তাম্বর, মাথায় পিঙ্গল জটাজুট, পিঙ্গল নাগেরা মাথায় জটা হয়ে দুলছে, সর্বাঙ্গে সাপের অলঙ্কার।"[৩]

উপন্যাসে মা মনসার এই ধর্মীয় মিথের ব্যবহার অভিনব এবং ভয়ানকও বটে। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আমাদেরকে নিয়ে গেছেন দৈনন্দিন জীবনাভিজ্ঞতার বাইরে ভাগীরথীর কূল সংলগ্ন সাপ, কুমীর, জল, বাঘ প্রভৃতি ঘেরা এক নাভিশ্বাস জগতে। সেই জগতে বর্ষার সময় নদীর জল টইটম্বুর হয়ে যায়। ফলে হিজলবনের সমস্ত সাপ গাছে আশ্রয় নেয়। সেই সময় নৌকো করে নদীপথে গাছের তলা দিয়ে যাওয়া ভীষণ বিপদ জনক। কেননা ঔপন্যাসিক সামাজিক বিষয়ক প্রবাদ বলেছেন—"শিরে হৈলে সর্পাঘাত তাগা বাঁধিবি কোথা?"[৪]

উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বিভিন্ন বেদেদের প্রসঙ্গ তুলেছেন। সাল-বেদে, মাঝি-বেদে, বিষ-বেদে প্রভৃতি। আলোচ্য উপন্যাসে বিষ-বেদের কথা বলা হয়েছে। বিষ-বেদেরা সাপ ধরে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। তারা বিভিন্ন প্রজাতির সাপ ধরে। এই প্রসঙ্গে কাল-নাগিনির কথা উঠে এসেছে—

"কালনাগিনী ওদের কাছে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। তারাই ওদের ঘরের লক্ষ্মী, কালনাগিনীই ওদের অন্ন যোগায়. . .কালীনাগের কন্যে নাগিনী, ও বংশে কন্যে ছাড়া পুরুষ নাই। তার লেজ খানিকটা মোটা। বেহুলা জাঁতি দিয়ে কেটে নিয়েছিল তার

লেজের খানিকটা। কালনাগিনীর নাগের জাত নাই। অন্য নাগের জাতের সন্তান প্রসব করে কালনাগিনী। তাই থেকে হয়েছে নাকি নানা জাতের কেউটের সৃষ্টি। মা-বিষহরির ইচ্ছায় ওদের মধ্যে দুই-চারিটি কন্যা একেবারে মায়ের জাত নিয়ে জন্মায়, কালনাগিনীর ধারা অব্যাহত রাখবার জন্য।"[৫]

ভাগীরথীর কূলে হিজল বিলের পাশে মা-মনসার বাসস্থান। তাই বিষবেদেরা ঘাস-বন-মশা প্রভৃতির মধ্যেও সেখানে থাকতে পছন্দ করে। বন্যায় ঘাস পচে, ভ্যাপসা দুর্গন্ধ হয়, মাছি ভনভন করে, ঘাসবনের মধ্যে বাঘ গর্জানোর শব্দ হয়, হিজল বিলের জলে হাঙর-কুমীরের আনাগোনা প্রভৃতির মধ্যেও বিষবেদেরা সেখানে পরমানন্দে থাকে। কেননা সেখানে কালনাগিনির বাস। তাদের লোকগানে এভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

"জয় বিষহরি গ ! জয় বিষহরি !
চাঁদো বনে দণ্ড দিল
তোমার কৃপায় তরি গ।"[৬]

উপন্যাসে এইরকম অসংখ্য বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিচিত্র বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির প্রয়োগের মাধ্যমে 'বেদে' সমাজের বিচিত্র দিক পাঠকের সামনে উঠে এসেছে।

উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির বিষয়বৈচিত্র্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের মুখ্য বিষয়। তবে শুধুমাত্র কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমেই তার বিষয়কে তুলে ধরা নয়, সেই সঙ্গে কাহিনির সঙ্গে সেইসকল লোকসংস্কৃতিসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র, কাহিনির মধ্যে সেইগুলি পরিবেশনের যৌক্তিকতা, গুরুত্ব এসবও আলোচনাযোগ্য। আর সেই সকল আলোচনার প্রেক্ষিতেই দেখা যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগিনী কন্যার

কাহিনী' উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক যে-সকল লোকপুরাণ, লোকগান, ছড়া, ধাঁধা, মন্ত্র বা প্রবাদের পরিবেশন করেছেন, তা কষ্টকল্পিত নয়, লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে, সহজাত শিল্পকুশলতার সঙ্গে এ সকল বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি উপন্যাসটিকে এক ভিন্ন মাত্রা দান করেছে।

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম ঔপন্যাসিক মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭)। তিন বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গুণী লেখক যখন সাহিত্যজগতে বন্দিত ঠিক সেই সময় সাহিত্যজগতে স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে তুলে ধরেন তিনি। বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানি মনোজ বসু বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতি তাঁর কথাসাহিত্যের মূল উপজীব্য। প্রায় চার দশকের অধিক সময় ধরে বিপুল সাহিত্য সম্ভারে বাংলার সাহিত্য ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তুলেছেন তিনি। তাঁর অন্যতম একটি উপন্যাস হল 'জলজঙ্গল' (১৯৫১)।

'জলজঙ্গল' উপন্যাসটি সুন্দরবন অঞ্চলের বেনেপোতা, মৌভোগ ইত্যাদি গ্রামের পটভূমিকায় রচিত। তথাকথিত সভ্য সমাজ থেকে দূরে জলময়, জলাকীর্ণ, আদিম জীবজন্তু, অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সেখানকার মানুষের উদ্দাম জীবনযাপন প্রভৃতি সবটাই ছিল ঔপন্যাসিকের নখদর্পণে, সেই অভিজ্ঞতার ফসল 'জলজঙ্গল' উপন্যাসটি। তাই তিনি বলেন—

". . . গ্রাম আমার সুন্দরবন অঞ্চল থেকে দূরবর্তী নয় . . . কাঠ কাটতে, মধু ভাঙতে জীবিকার শতবিধ প্রয়োজনে লোকে বনে যায়, বাঘ-কুমির সাপের কবলে পড়ে—তার মধ্যে কতজনে আর ফেরে না। . . . সুন্দরবন নিয়ে দুটো উপন্যাস (জলজঙ্গল, বন কেটে বসত) ও

কতকগুলো গল্প লিখেছি আমি। কোন কোন অংশ একেবারে বনের ভিতরে খালের উপর নৌকোয় বসে লেখা।''[৭]

ঔপন্যাসিক উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চলের বিশ্বাস, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, মিথ ইত্যাদির সংমিশ্রণে উপন্যাসকে সেই অঞ্চলের সামাজিক দলিল করে তুলেছেন যেন। আলোচ্য উপন্যাসে অসংখ্য বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ব্যবহৃত হয়েছে, যা বিষয়বৈচিত্র্যেও ভিন্ন ।

উপন্যাসের সূচনা অংশে একটি সামাজিক ছড়ার মাধ্যমে উপন্যাসের ভূমিকা করা হয়েছে। এই ছড়ার মাধ্যমে কেন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে আভাস দেওয়া হয়েছে—

''মা গো মা—তোর বালক আইল বনে,
শত্তুর-দুশমন দমন করে রাখিস ছি-চরণে।''[৮]

বনদেবী তথা বনবিবির ওপর এদের অগাধ বিশ্বাস। কারণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেখানে প্রতিপদে, তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় একমাত্র দেবী। এই প্রবণতা মানুষের অদ্যাবধি চলে আসছে। আর এই পর্যায়েই তৈরি হয় মিথ-এর। উপন্যাসেও দেখতে পাওয়া যায় বনবিবি ও ফেলনার মিথ-এর কথা। ড. মযহারুল ইসলাম এই মিথ প্রসঙ্গে বলেন— ''মানুষের আদিমতম বিশ্বাস, চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণ, ভয়ভীতি, বিপদ থেকে উদ্ধারের ব্যাকুলতা, ধর্মীয় চেতনা, জৈবিক আবেদন, মানসিক উত্তেজনা ও উদ্বেল, হৃদয়বৃত্তির নানাদিক যে-সব কাহিনীতে প্রতিফলিত, সেগুলিকেই বলা যায় পুরাকাহিনী।''[৯]

মাটি ও মানুষের একান্ত আপনজন মনোজ বসু তাঁর দরদী মন দিয়ে জলাভূমির জীবনকে চিত্রায়িত করেছেন 'জলজঙ্গল' উপন্যাসে। মান্যধর মোড়লের

ছেলে উমেশ। ছোটোবেলায় স্কুলে না গিয়ে, বাড়ির কাজ না করে গান, ছড়া প্রভৃতি নিয়েই তার জীবন অতিবাহিত হয়। উপন্যাসে সে পদ্মকে 'রাবণ বধ' পালার পৌরাণিক বিষয়ক গান শোনায়। 'রাবণ বধ' পালার গান সুন্দরবন অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয় সংগীত।

মধুসূদনের কর্মচারী দুর্লভচন্দ্র বন থেকে 'সুদূর' বনের কাঠ কেটে চালান দেবার কথা বলে মতিরামকে। এই ব্যবসায় অঢেল টাকা। তাই দুর্লভচন্দ্র মতিরামকে এই প্রসঙ্গে একটি সামাজিক প্রবাদ প্রয়োগ করে। প্রবাদটি হল—"যার নেই মূলধন, সে-ই যায় বাদাবন।"[১০] সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ যে কতটা দুঃখ কষ্ট সহ্য করে সেই অঞ্চলে বসবাস করে তা আমাদের অনেকের অজানা। এই সাধারণ সামাজিক প্রবাদটি ধ্রুবসত্য। সেখানকার মানুষ চরম দুরবস্থার কারণে বনে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও মধু, মোম, কাঠ সংগ্রহ করতে বনে যেতে হয়।

আদিম মানুষের মনে মন্ত্রের উদ্ভব হয় সৃজনশীল শিল্প মাধ্যমগুলির (নৃত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, পুরাণ, গল্পকথা) মধ্য দিয়ে এবং বলা যায় মানুষের জীবিত থাকার জন্য শিকার সংগ্রহের অনুসন্ধান এবং তার তাগিদ থেকে মন্ত্রের আবির্ভাব। উপন্যাসে মান্যধর মোড়ল ও বয়স্ক মুরুব্বিরা তাদের আমলের গল্পকথা বলতে গিয়ে সামাজিক মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন—'মাড়ি আঁটার মন্তোর', 'চাবি খোলার মন্ত্র' প্রভৃতি। এই মন্ত্র বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্যতম একটি অঙ্গ।

জলকাদার সময় ছাতা এবং লাঠি অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি বস্তু। উপন্যাসে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে শিক্ষামূলক প্রবাদের উপস্থাপন করা হয়েছে। উমেশ বৃষ্টির মধ্যে বাড়ুজ্জে মহাশয়ের বাড়ি যেতে চায় কিন্তু রাস্তায় মুষলধারে বৃষ্টি নামে। উমেশ

শেষে পদ্মদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এবং সেখানে রাধা-কৃষ্ণলীলার ধর্মীয় গান ধরে। বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই লোকসংগীতের অবদান অনস্বীকার্য।

সাধু মতিরামের বাড়িতে পুলিশ তল্লাসি করতে এলে সেখানে পুলিশের হাতে পড়ে পকেট-'গীতা', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', পূজার কোশাকুশি প্রভৃতি। সাধু-সন্তের বাড়িতে যে সমস্ত জিনিস পাওয়া যায় তাই-ই সেখানে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটি সামাজিক প্রবাদ উপস্থাপন করা হয়। প্রবাদটি সমাজে খুব জনপ্রিয়। "কারো সাতেও থাকি নে, পাঁচেও থাকি না।"[১১] কিন্তু সাধুর তক্তপোষের তলায় কাচামাটির প্রলেপ দেওয়া দেখে পুলিশের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে এবং সেই উঠানের মাটি খুঁড়ে সোনার গহনা ভর্তি হাড়ি উদ্ধার করে পুলিশ। মতিরাম বাবু যদিও সেই সমস্ত সোনার সামগ্রী নিজের বলে দাবি করে। কিন্তু তাতে সুবিধা হয়নি। দারোগা তা অবিশ্বাস করেছে। পুলিশ জানায় রায়গ্রামে মধুসূদন বাবুর বাড়ির দোতলায় লোহার আলমারি থেকে সোনার গহনা চুরি গেছে। এই সোনাগুলি সেখানকার। চোর 'চাবি খোলার মন্ত্র' জানত। পুলিশ চুরির অভিযোগে মতিরামকে থানায় নিয়ে যেতে চাইলে মতিরাম বিদ্রোহীভাবে সামাজিক প্রবাদ ব্যবহার করেন। বলে—"মগের মুলুক নয়।"[১২] মধুসুদন বাবু যখন জানতে পারে মতিরামের বাড়ি থেকে সোনার গহনা উদ্ধার হয়েছে তখন মতিরামকে বিদ্রুপ করে সামাজিক প্রবাদ বলে— "বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন।"[১৩] তার অর্থ মতিরাম সমাজ সম্মুখে সাধুভাব এবং অন্তরে সে মন্দোলোক।

সুন্দরবন অঞ্চলে মোম ও মধু সংগ্রহের মরশুম চৈত্রমাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত। মউলেরা মধুসংগ্রহের জন্য বনদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে কাজে লাগে। তখন তারা মৃত্যুকেও পরোয়া করে না। কিন্তু এত বিপদ সত্ত্বেও বনে ঢোকার অধিকার

সবার থাকে না। বনকরদের দৃষ্টি এড়িয়ে বেশিরভাগ সময় বনে ঢুকতে হয়। একদিন কেতু ও তার সাথীরা বনে এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হয়। "ধবধবে কাপড় পরা বউ একটি। দুকড়ি মাঝি গল্পে যেমন বলে থাকে অবিকল তাই।"[১৪] এই ভৌতিক পরিবেশের গল্প যা বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অঙ্গ এবং তা পরম্পরায় বহমান। বাদাবনের সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক প্রবাদ— "জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ।"[১৫] প্রবাদের মাধ্যমে সেই নোনাভূমির ভৌগোলিক কঠোর অবস্থানের দিক নির্দেশ করে।

বাদাবনে অলৌকিক গালগল্প একটি সাধারণ বিষয়। 'বাঘ-বন্ধন' থাকা সত্ত্বেও জনৈক ব্যক্তিকে বাঘে নিয়ে গেলে এলাকার মানুষদের মধ্যে কথাবার্তা হয় যে সত্যিকারের বাঘ থাকলে সে 'বাঘ-বন্ধন' ভেদ করতে পারত না। অশরীরী কোন আত্মা বাঘ সেজে এসেছিল। এইরকম ঘটনার আরো অনেক উদাহরণ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। এইরকমই আর একটি ঘটনা হল এক সময় অনেকজন মানুষ বাদাবনে এসে নৌকার উপর ঘুমোচ্ছে ঠিক সেই সময় দু'কড়ি নামে এক ব্যক্তির কানে মেয়ের কান্নার আওয়াজ আসে। তা শুনে দু'কড়ি কান্নার উৎস সন্ধান করতে থাকে। একসময় জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পায়— "ঝোপের আবডালে সোনার প্রতিমা এক মেয়ে হত্তেলের মতো রং—অমন রূপসী কেউ কোনদিন আপনারা দেখেন নি।"[১৬] আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে মেয়েটার কাছে যেতেই সে মেয়ে উধাও হয়। আবার দুকড়িকে যেন মেয়েটি ইশারায় ডাকে। দুকড়ি মেয়েটির পিছু নেয়। নৌকার সহযাত্রীরা হঠাৎ ঘুম চোখে দুকড়িকে জলের মধ্যে নেমে থাকতে দেখে তাকে তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠতে বলে এবং বড় সড় বিপদ থেকে রক্ষা পায়। এইরকম অলৌকিক লোকগল্প বাদাবনে প্রতিমুহূর্তে শোনা যায়।

উপন্যাসে বাদাবনে বিজলীলতার পৌরাণিক মিথটি অন্যতম। জাহাজে করে বাদাবনে বিভিন্ন সময়ে হার্মাদরা লুঠ করতে আসত। শুধু টাকা-কড়ি, ধন-সম্পত্তি নয় মেয়েদেরকেও ভোগ করত। এইরকমই পৌরাণিক মিথে বিজলীলতা নামে এক মেয়ে উপস্থিত সকলকে শায়েস্তা করে। সাধারণ মানুষকে সাহেবদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করে।

উপন্যাসে অনেক সামাজিক, পৌরাণিক, অর্থনৈতিক বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ব্যবহার হয়েছে এবং সেগুলির বিষয়ও বৈচিত্র্যে ভরপুর। বিচিত্র বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ব্যবহারে এই উপন্যাস অন্যভাবে আমাদের কাছে ধরা দেয়।

গ্রামীণ বলয়ে বেড়ে ওঠা আবু ইসহাকের প্রথম উপন্যাস ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ (১৯৫৫)। এই একটি উপন্যাসই তাঁকে সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের অব্যবহিত পরে গ্রামীণ পরিবেশের সাধারণ মানুষ খ্যাদ্যাভাবে জর্জরিত এবং ধর্মীয় বেড়াজালে প্রতিনিয়ত ধুকতে থাকা মানুষের উপন্যাস হল ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে। দুর্ভিক্ষের কারণে গ্রামছুট মানুষের দল নিজ গ্রামে ফেরে। শফী, জয়গুন, মায়মুন, হাসু এরাও গ্রামে ফেরে। তাদের ঠিকানা ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’। গ্রামের লোকের বিশ্বাস এই ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’-তে মানুষ টেকা অসম্ভব। মন্বন্তরের সময় তারা এই বাড়ি বিক্রি করতে চাইলেও ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ হওয়ায় সে বাড়ি কেউ কিনতে চায়নি। উপন্যাসে পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী বাড়ির নাম ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’। উপন্যাসে অসংখ্য বাক্‌কেন্দ্রিক

লোকসংস্কৃতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তার বৈচিত্র্যও অভিনব। উপন্যাসে গদু প্রধানকে কেন্দ্র করে অলৌকিক গল্পের প্রয়োগ দেখা যায়—

"সন্ধ্যার পর গদু প্রধান সোনাকান্দার হাট থেকে ফিরছিল। তার হাতে এক জোড়া ইলিশ মাছ। সূর্য-দীঘল বাড়ীর পাশের হালট দিয়ে যেতে যেতে সে শুনতে পায়—অই পরধ্যাইন্যা, মাছ দিয়া যা ! না দিলে ভালা অইব না। প্রথমে গদু প্রধান ভ্রূক্ষেপ করেনি। পরে যখন পায়ের কাছে ঢিল পরতে শুরু করে, তখন তার হাত থেকে মাছ দুটো খসে পড়ে যায়। সে 'আউজু বিল্লাহ' পড়তে পড়তে কোনো রকমে বাড়ী এসেই অজ্ঞান।"[১৭] রহমত কাজীর ক্ষেত্রেও এই প্রকার অলৌকিক গল্পের প্রয়োগ দেখা যায়।

জয়গুন ও শফিরা সম্পর্কে আত্মীয়। তারা 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'তে একসময় থাকার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর জেবেদ আলী নামে এক নামকরা ফকির বাড়ির সংকট মোচন করে। তিনি বাড়ির চারপাশে তাবিজ পুতে দেয় এবং মন্ত্র দিয়ে বাড়ির চারপাশে পাহারাদার বসায়। তারাই নাকি সূর্য দীঘল বাড়ি রক্ষা করবে। এ প্রসঙ্গে 'ধুলাপড়া'র কথা বলা হয়েছে। অভাবি সংসারে হাসু তার বোনের জন্য চুড়ি কিনে আনলে জয়গুন (হাসুর মা) সামাজিক প্রবাদ কেটে বলে—"খাইতে নাই হুইতে রাঙ্গা পাড়ি।"[১৮]

জয়গুনের অন্যপক্ষের ছেলে কাসু। জয়গুনের প্রথম পক্ষের স্বামী অর্থাৎ হাসুর বাবা জব্বর, তার মৃত্যুর পর কারিমবক্শের সঙ্গে জয়গুনের বিয়ে হয়। জয়গুনের সেই বিয়েও সুখের হয়নি। বিয়ের কিছুকাল পরে জয়গুনকে তালাক দেয় করিমবক্শ। এই প্রসঙ্গে একটি সামাজিক ছড়ার প্রয়োগ করা হয়—"পুত্র সে হাতের লাঠি।"[১৯] সমাজের এই ভাবনার বশবর্তী হয়ে তিন বছরের শিশু কাসুকে করিমবক্শ নিজের কাছে রেখে দেয়। উপন্যাসে জয়গুনের মেয়ে মায়মুন। তার

ছোট্ট হাসের বাচ্চাদেরকে নিয়ে তার দিন কাটে। তাদের খাওয়ানোর জন্য সে শামুক ছাড়ায় আর বিনোদনমূলক গান গায়।

উপন্যাসে মায়মুন তেঁতুল তলায় বড়শি দিয়ে মাছ ধরে। কিন্তু শফী নানা-রকমভাবে সেই মাছ ধরতে বিব্রত করে। বড়শিতে কোনো মাছ না ওঠায় সামাজিক সংস্কারবশত বড়শিটিকে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে আর সুর করে গেয়ে ওঠে বিনোদনমূলক ছড়া। আঞ্জুমান করিমবক্শের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী কাসুকে সে সহ্য করতে না পেরে অসৎ উপায়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে ছড়ার মাধ্যমে কাসুকে তার আসল মায়ের কথা জানায়।

করিমবক্শ ছেলে কাসুকে অতিরিক্ত খেয়াল রাখে। যাতে কাসু তার আসল মায়ের কাছে না যেতে পারে। চোখের আড়ালে যে-কোনো মুহূর্তে জয়গুন এই কাজ যাতে না করতে পারে, তাই জমিতে ধান কাটার সময়েও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যায় সে। অন্য জমিতে চাষিরা ধান কাটতে কাটতে বিনোদনমূলক গান গেয়ে ওঠে।

করিমবক্শের ছেলে কাসু যাতে হাতছাড়া না হয় তাই কাসুকে ভূতের ভয় দেখাতে থাকে। ভূতের ভয়ে ছেলের ভীষণ জ্বর আসে। এমন অবস্থায় সেই সময় গ্রামের ওঝার কাছে নিয়ে গেলে সেখানে কাসুকে 'হাতচালান' দেওয়া হয়। দিদার-বক্শ হাতচালান দিয়ে কাসুর শরীরে ভূতকে তাড়ানোর চেষ্টা করে এবং ভূত তাড়ানোর সময় সবাইকে সাবধান করে দেয় চোখ যেন কেউ উপরে না তোলে। এবং ভৌতিক মন্ত্র পড়তে থাকে সে—

> "আমার নাম দিদার বক্শ শুইন্য মন দিয়া
> আমার নামে ভূত-পেতনি সবাইর কাপে হিয়া!"[২০]

'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে অনেক ছড়া, ধাঁধা, ভৌতিক লোকগল্প, প্রবাদ প্রভৃতি বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি দেখতে পাওয়া যায়। যেগুলোর মধ্যে কোনোটি প্রাচীন মাছ ধরার ছড়া, কোনোটি ধর্মীয় অনুশাসনের লোকগল্প, কোনোটি আবার ট্রেনে খাবার বিপণনের ছড়া প্রভৃতি।

পৃথিবীতে তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থলের মধ্যে বসবাসকারী একাংশ মানুষের প্রধান অবলম্বন জল। তাই নদী, খাল, বিল, সমুদ্রের কিনারায় গড়ে উঠছে জলজীবী মানুষের বসতি। জল যাদের প্রধান জীবিকার উৎস—সেই সব মানুষের কাছে নদী কখনো স্নেহময়ী, কখনো বা দানবী। সেই ভয়ঙ্কর রূপকে বশে এনে জেলেরা নদী থেকে তুলে আনে মাছ। এই মৎস্যজীবীদেরকে নিয়ে দেশ বিদেশে রচিত হয়েছে নানা সাহিত্য। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে সেই ধারারই অন্যতম অভিজ্ঞান।

মৎস্যজীবীকে কেন্দ্র করে অদ্বৈত মল্লবর্মণের আগে বাংলা ভাষায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাস রচনা করেন। অমরেন্দ্র ঘোষ (১৯০৭-১৯৬২) 'চরকাশেম' (১৯৪৯) রচনা করেন। সমরেশ বসু রচনা করেন 'গঙ্গা' (১৯৫৫)। এরপরে 'তিতাস' এর রচনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মৎস্যজীবীদের নিয়ে উপন্যাস রচনার পরে আর কি সেই বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল—এই কথা প্রসঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণ বলেন—"মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় artist, master artist, কিন্তু বাওনের পোলা রোমান্টিক। আর আমি তো জাউলার পোলা।"[২১]

ঔপন্যাসিকের এই কথাতেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কেন এই উপন্যাসের প্রয়োজনীয়তা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'মালো' তথা সমাজকে বাইরে থেকে দেখেছেন কিন্তু অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'মালো' সমাজকে প্রত্যক্ষত দেখেছেন। তাই এই তিতাস নদীকে কেন্দ্র করে তিতাস পাড়ের সন্তান অদ্বৈত রচনা করেন এই উপন্যাস। তিতাস তিরবর্তী জেলেদের পাওয়া, না-পাওয়া, আনন্দ-দুঃখ, বিশ্বাস-সংস্কার ইত্যাদি শিল্পীহস্তে নির্মাণ করেন তিনি। অদ্বৈতের এই উপন্যাস 'মিথ্যা রোমান্টিকতা' ও 'সত্যের ছলনা' থেকে মুক্ত। মানুষ ও প্রকৃতির বিশাল পটভূমিতে তিনি আসলে এই উপন্যাসে নদী ও মানুষের এক চিরায়ত যুগলবন্দি রচনা করেছেন। তাই উপন্যাসটি কেবল আখ্যান বর্ণনাই নয়, মালো সমাজের ডক্যুমেণ্টারি হিসেবেও পরিগণিত করা যেতে পারে।

ইউরোপ বা আমেরিকার 'Folk' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ থাকলেও এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ 'Folk' শব্দ বলতে বোঝে যারা তথাকথিত অক্ষরজ্ঞান থেকে বঞ্চিত, শ্রমজীবী, যাদের জীবনাচরণের অন্যতম অবলম্বন, বিশ্বাস-সংস্কার, প্রথা অবলম্বনকারী তারাই প্রধানত লোক বা 'Folk' বলে চিহ্নিত। যারা মূলত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবন যাত্রায় বিশ্বাসী। তাদের সংস্কৃতিই এক অর্থে লোকসংস্কৃতি। আর বাংলাদেশ যেহেতু নদীকেন্দ্রিক তাই বাংলার সংস্কৃতিতে নদী মস্ত-বড়ো জায়গা জুড়ে রয়েছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস সেই সংস্কৃতিরই অন্যতম অভিজ্ঞান।

১৯৫৬ সালে মোহাম্মদ আকরাম খাঁর সম্পাদনায় মাসিক 'মোহম্মদী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। সাতটি সংখ্যায় এর প্রকাশ ঘটে এবং অদ্বৈতের মৃত্যুর পর 'পুথিঘর' নামক প্রকাশনী

থেকে উপন্যাসটি বই আকারে বের হয়। চারটি খণ্ডে উপন্যাসটি বিন্যস্ত। প্রতিটি খণ্ডে আবার দুটি করে পর্ব রয়েছে। নিচে রেখাচিত্রের মাধ্যমে তার পরিচয় দেওয়া হল—

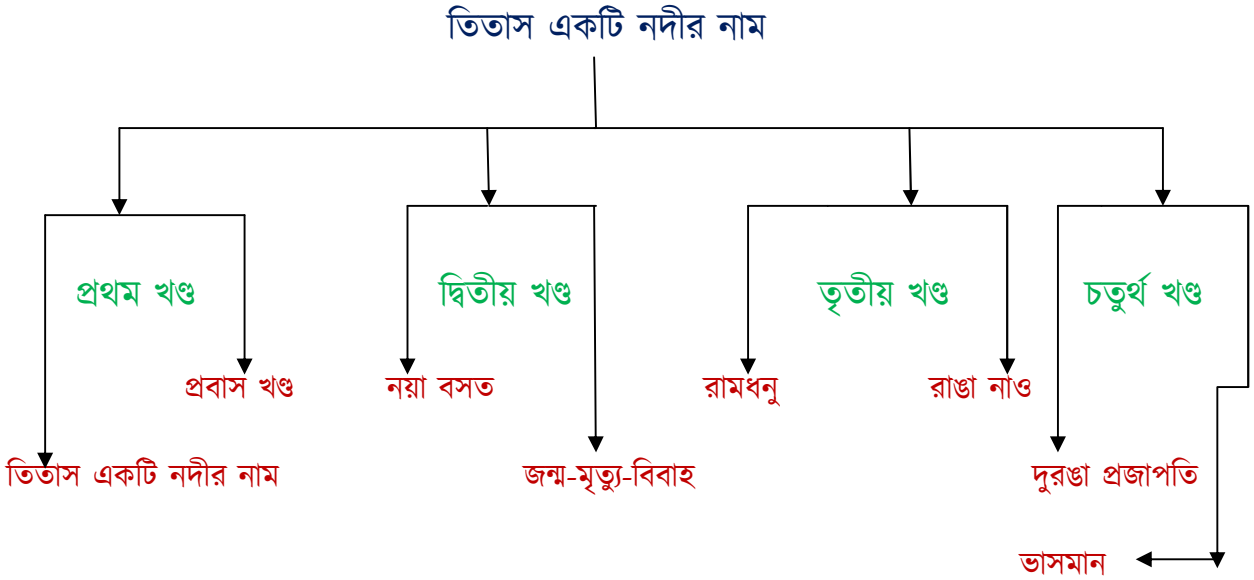

অদ্বৈত মল্লবর্মণ দারিদ্র্যের সঙ্গে মানুষ হয়েছেন। তিনি নিজে একজন মালো সমাজের সন্তান। ফলে মালোজীবনের দারিদ্র্য, অভাব, না খেতে পাওয়ার যন্ত্রণা সবই তার জানা। তাই তিতাস তীরের 'মালো'দের কথাচিত্র নির্মাণ করতে কৃত্রিমতার বা কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি তাকে। সমালোচক প্রভাসচন্দ্র সামন্ত তাই বলছেন—

"তিতাসপাড়ের জীবনচিত্র রচনায় তাঁকে দস্তানা পরা হাতে জীবনকে স্পর্শ করার কৃত্রিমতার দায় গ্রহণ করতে হয়নি। কিংবা তাঁর মধ্যে রোদচশমার আড়ালে আপন দৃষ্টিকে বাস্তবের খরতাপ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে কল্পজগৎ সৃষ্টির অপকৌশল কাজ করেনি। পরিবর্তে এক আত্যন্তিক নিবিড় সংযোগী আন্তরিকতায় তিনি তিতাস ও তার তীরবর্তী জীবনের ভাঙাগড়ার ছবি বিশ্বস্ত বাস্তবতায় চিত্রিত করেছেন।"[২২]

লেখক মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা-সংস্কার প্রভৃতির চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বিভিন্ন বাক্‌কেন্দ্রিক-লোকসংস্কৃতিও তুলে ধরেছেন। এবং সেই বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির বিষয় বৈচিত্র্যে পূর্ণ।

উপন্যাসে তিতাস তীরবর্তী মালো পরিবারের উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সবই তিতাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। তারা জলচর। জলেই তাদের মুক্তি। তিতাসকে তারা মাতৃসম মনে করে। তিতাসে জেলের সন্তানেরা মাছ ধরে নির্ভয়ে। তাদের আবেগ-উৎসাহ স্বাভাবিক হয় এই মাঝারি মাপের তিতাসের উপর। তাই নদীর উপর দিয়ে নৌকায় অন্য কোনো সুন্দরী মহিলা গেলে আনন্দে গেয়ে ওঠে—"আগে ছিলাম ব্রাহ্মণের মাইয়া করতাম শিবের পূজা, জালুয়ার সনে কইরা প্রেম কাটি শণের সূতা রে নছিবে এই ছিল।"[২৩]

উপন্যাসে ব্যবহৃত এই সামাজিক লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে মালোজীবনের প্রকৃত অবস্থানটি চিহ্নিত করে। ঔপন্যাসিক জেলে-মাঝিদের জীবনে জাল, নৌকো প্রভৃতি যে অন্যতম অঙ্গ সেটাই এই গানে ইঙ্গিত করেন। তিতাস তীরের মালোদের পরিচয় দেওয়ার সময় ঔপন্যাসিক বলেছেন—

"ঘাটে-বাঁধা নৌকা, মাটিতে ছড়ানো জাল, উঠানের কোণে গাবের মট্‌কি, ঘরে ঘরে চরকি, টেকো, তক্‌লি—সূতা কাটার, জাল বোনার সরঞ্জাম। এই সব নিয়াই মালোদের সংসার।"[২৪]

এই বিবরণে বোঝা যায় মালোদের দৈনন্দিন জীবন মাছকে কেন্দ্র করে অতিবাহিত হয়। মালোদের জীবিকা ছাড়াও তাদের সংস্কার, বিশ্বাস, পূজা-পার্বণ প্রভৃতির সমান গুরুত্ব রয়েছে। তাই মাঘ মাসের শেষ তারিখে তারা সামাজিকভাবে 'মাঘমণ্ডলের ব্রত' পালন করে। মূলত অবিবাহিত মেয়েরা এই ব্রত পালন করে। বিবাহের কামনা এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। মালোদের জীবনে এই সামাজিক বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিটি ধর্মীয়ভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ লোক-উপাদান।

তিতাস পাড়ের 'মালো'দের নদীকে কেন্দ্র করে তাদের জীবন-অতিবাহিত হয়। উৎসব, গান, গল্প ইত্যাদি বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি এই নদীকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে। উপন্যাসে নৌকা চালানোর সময় বিভিন্ন লোকসংগীত গাওয়া হয়। নৌকা নিয়ে বাইচ প্রতিযোগিতার সময়ও সারিগান পরিবেশন করতে দেখা গেছে উপন্যাসে। আবার নৌকায় রাত্রি যাপনের সময় বিভিন্ন নৌকা থেকে বিভিন্ন ঘরানার লোকসংগীতও পরিবেশন করতে দেখা গেছে। সেই সমস্ত সংগীতের বিষয়বস্তু যেমন বিচিত্র, তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ তার গানের ঘরানা। কোনোটি ভাটিয়ালি, কোনোটি সারি, কোনোটি জারি, আবার কোনোটি বারোমাসি, এছাড়াও মাঘমণ্ডলের ব্রতের গান পরিবেশন করতেও দেখা গেছে উপন্যাসে। নানা ব্রতকথা, পূজা-পার্বণ, অনুষ্ঠানগুলিও 'তিতাস একটি নদীর নাম' নামক উপন্যাসে নিগূঢ়ভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

এই উপন্যাসে লোকসংগীতের মতো ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথার ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ। উপন্যাসের একজন অন্যতম চরিত্র উদয়তারা। সে তো 'শিলোকের রাজা' মুখে মুখে 'শিলোক' বা ছড়া অবাধে বলতে পারে সে। উপন্যাসে অসংখ্য এই বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। লোকসংস্কৃতিপ্রেমী অদ্বৈত মল্লবর্মণ এই

বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিগুলি নিজের এলাকা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। উপন্যাসে এই বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি সুচারুরূপে তার প্রয়োগ করেছেন।

ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের শুরুতে বলেছেন তিতাসের ইতিহাস বিশেষ কিছু নেই ঠিকই, তিনি আরও জানান যে মায়ের স্নেহ, ভায়ের প্রেম, বৌ-ঝিয়েদের দরদের অনেক ইতিহাস এতে রয়েছে—

"পল্লী জীবনের ব্যথা বেদনা, সাধ আকাঙ্ক্ষা, কৃষিজীবনের নানা আঙ্গিক, মেয়েলি ব্রত, বাঙালী উৎসব, পালা-পার্বণ, জেলে জীবনের অনুষঙ্গ গানে, প্রবাদ-প্রবচনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এসব মিলেমিশেই এই উপন্যাসে মালোদের লোকজীবন যেমন পূর্ণতা পেয়েছে, তেমনি এই সত্য দৃঢ়মূল হয়েছে যে অদ্বৈত মল্লবর্মণের পা ডোবানো রয়েছে দেশের মাটিতেই।"[২৫]

বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের আঙিনায় সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৫৭) অন্যতম একটি সংযোজন। উপন্যাসে বর্ণিত 'গঙ্গা' নদী কলকাতার দক্ষিণ দিক দিয়ে বয়ে গেছে। উপন্যাসের সমস্ত ঘটনার পরিমণ্ডল মূলত এই নদীর উপরেই গড়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। উত্তরে হালিশহর থেকে দক্ষিণে বাগবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত এই উপন্যাসের মহানাগরিক পটভূমি। তবে এ নাগরিক পটভূমিতেও ধরা পড়েছে লোকজীবন ও লোকউপাদান। এ লোকজীবন মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের। তবে সে জীবন ও লোকউপাদান খোঁজার আগে কিছু তথ্যকথা বলতে হয়। সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৬৩ সনের শারদীয় 'জন্মভূমি' পত্রিকায় এবং আশ্বিন ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সুবোধ দাশগুপ্ত অঙ্কিত প্রচ্ছদে মুদ্রিত ছিল লোকদেবী গঙ্গার ছবি—দ্বিভূজা, মকরা বাহনা, শ্বেতপদ্ম ধারিনী ও শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা। অবশ্য দেবীর অভয়মুদ্রা ধারিনী রূপটি এই ছবিতে

ছিল না। উল্লেখ করা চলে যে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় সমরেশ বসু যে গঙ্গা মূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে এই ছবির সবচেয়ে বড়ো মিল হল দেবীর বাহনটির। হাতিমুখো বাহন বাঁকানো লেজ, মস্ত লম্বা শুঁড় আর অপলক গোল দুটি চোখ ! দেবীর সোনার মতো রঙ, চতুর্ভূজ মূর্তি দেখে নায়ক বিলাস সমুদ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গঙ্গায় পাড়ি দেওয়া সমাপ্ত করে। বিলাস সমুদ্রের প্রতি এত টান অনুভব করে, যে হিমির প্রতি তার মনের টান হ্রাস পায়। তাই তার কণ্ঠে সামাজিক সংগীত পরিবেশিত হয়—

"আমার প্রাণে নাই সুখ-হে
বড় উথালি পাথালি আমার বুক।"[২৬]

বিলাস উপন্যাসে অসংখ্য বিনোদনমূলক, কখনো বা সামাজিক বিষয়ক গান গেয়েছেন। এভাবেই জল বা সমুদ্র বিলাসের কণ্ঠে গান যুগিয়েছে। তবে সে গান ব্যক্তিক হয়েও যেন সমগ্র 'মাছমারা' সম্প্রদায়ের হয়ে উঠেছে; যে কারণে এ সকল গানকেও লোকগানের মর্যাদা দিতে কোনো দ্বিধাবোধ হয় না। কারণ এই 'মাছমারা' সম্প্রদায়টি লেখকের বর্ণনায় 'মালা', 'ধীবর' বা 'কৈবর্ত'। তাদের কাছে জলই জীবন। অনেকটা মাছের মতো অথৈ জল বা সমুদ্র যেন তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। আর সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে তাদের উপায় নেই। তাই সমুদ্র তথা জল এই 'মাছমারা' সম্প্রদায়টিকে তাদের একটি নির্দিষ্ট বা বলা চলে একান্ত নিজস্ব জীবন যাত্রা, বিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা, আচার-আচরণ গড়ে তুলতে সহযোগিতা করেছে। তাদের এই বিশিষ্ট জীবনযাত্রা এবং জীবনধারণের মূল কতগুলি সরঞ্জাম— নদী বা সমুদ্র, নৌকা, জাল— এ সমস্ত কিছুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সমগ্র সম্প্রদায়টির জীবনাচরণে লোকজীবনের মর্যাদা পেয়েছে। আর তাদের

লোকজীবনে মিশে রয়েছে অজস্র লোক-উপাদান যা এই উপন্যাসে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। একথা বলে নেওয়া ভাল যে, নাগরিক অবস্থান হলেই যে সেখানে লোকসংস্কৃতি থাকবে না, এমনটা বলা যায় না। লোকসংস্কৃতি একটি মানসিক ক্রিয়া। উপন্যাসে মাঝি-মাল্লাদের শহরের কাছ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর উপর তাদের জীবন চলেছে। কিন্তু তারা সংস্কার মুক্ত হতে পারেনি। উপন্যাসে 'মাছমারা'দের মধ্যে নানা মিথ, কিংবদন্তি, লোককথা, প্রবাদ, ধাঁধা প্রভৃতি চলমান। বলা বাহুল্য, সেগুলি লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। সেই অঞ্চলের 'মাছমারা'দের নিজস্ব কিছু রীতি রেওয়াজ, নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গিমার প্রচলন দেখা যায়, যা লোক ঐতিহ্যে পর্যবসিত হয়েছে।

উপন্যাসে লক্ষ করা যায় 'মাছমারা'রা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নানারকম পরম্পরাগত সংস্কার তাদের মনে জেগে উঠেছে। দক্ষিণ রায়ের লোকপুরাণ তার মধ্যে অন্যতম। সে কাহিনি সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের দক্ষিণ রায়ের কাহিনি থেকে স্বতন্ত্র। উপন্যাসে নিবারণ সাইদার তার অনুজ পাঁচু ওরফে পঞ্চাননকে শুনিয়েছিলেন সেই কাহিনি। টানের সমুদ্রে বিশেষ ভয় থাকে না। কিন্তু সেই সময় ডাঙার দিকে চোখ ফেরানো উচিত নয়। কেননা ডাঙার তুক বড়ো তুক।

উপন্যাসে দানোর পৌরাণিক মিথ মালোদের কাছে গভীর বিশ্বাসের বিষয়। বাস্তবিক সেই মিথ কতটা যুক্তিযুক্ত তা বিচার্য বিষয় নয়। এক্ষেত্রে 'মাছমারা'দের কাছে তা ধ্রুব সত্য। আবার মালোদের কৌমজীবন সম্পর্কিত লোকগল্পকে বংশ পরম্পরায় তারা বিশ্বাস করে। 'গঙ্গা' উপন্যাসে 'ঝালো-মালো'র পৌরাণিক মিথ উপন্যাসের অন্যতম একটি লোকপুরাণ। তাদের কাহিনি হল, ঝালো-মালো এক মায়ের পেটের সন্তান। তাদের জন্ম ভগবানের গলার মালা থেকে। তারা দুই ভাই-ই

ভগবানের ইচ্ছায় 'মাছমারা'। পতিত হল 'মালো'। কারণ একদিন 'ঝালো-মালো'র ঘরে এসেছেন তাদের গুরুদেব। তারপর গুরুদেব ভোজন করে এবং তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃক্রিয়া সারেন। গুরুদেবের প্রাতঃক্রিয়ার জল না দেওয়ায় মালো পতিত হয়। এইভাবে উপন্যাসে অসংখ্য বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির প্রয়োগ দেখা যায় এবং সেগুলির বিষয় বৈচিত্র্যপূর্ণ।

আব্দুল জব্বার-এর 'ইলিশমারির চর' (১৯৬১) উপন্যাসটি মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কঠোর দুর্দশার কাহিনি নিয়ে রচিত।

এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস এবং তখন তাঁর বয়স আটাশ। এত কম বয়সে নিম্নবঙ্গের লোকজীবন ও লোকভাষা নিয়ে 'ইলিশমারির চর' এর মতো সৃজনশীল উপন্যাস সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। উপন্যাসটি যেন তৎকালীন সময়ের দক্ষিণবঙ্গের লোকভাষার একেবারে জীবন্ত দলিল।

ইলিশমারির চরের মানুষজনদের অভাব, সুখ-দুঃখ, ঘৃণা, প্রতিশোধ, ভালোবাসা নিয়েই উপন্যাসের কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। এই চরের প্রধান মানুষ হল মৎস্যজীবী বা 'জেলে'। পূর্বতন মৎস্যজীবীদের নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলিতে মহাজনদের কঠোর রূপ এই উপন্যাসের মহাজনদের মতো এত নির্মম বা কঠোর ছিল কিনা তা ভেবে দেখার বিষয় ! উপন্যাসে মৎস্যজীবীরা নদীতে মাছ ধরতে যাবার আগে বদরগাজি (মুসলিম সম্প্রদায়) আর বরুণদেবকে (হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ) পূজা করে যাত্রা করেন। তাদের বিশ্বাস এঁনারাই তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারে। এইরকম বিশ্বাস মৎস্যজীবীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে প্রায়শই চোখে পড়ে। এই সংস্কার তাদের মনের গভীরে প্রোথিত।

এ উপন্যাসে জয়নদ্দি নদীতে মাছ ধরে ইলিশমারির চরে নিয়ে এলে সেখানে উপস্থিত এক মহিলা সেই মাছের দাম শুনে প্রবাদ কাটে— "দাঁড়ি-মাঝির পরনে ট্যানা আর পাজারী মাগীর কানে সোনা।"[২৭] আবার আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত জেলেরা জীবনের কষ্ট ভুলে থাকতে নেশা করে। জয়নদ্দি উপন্যাসে তাড়ি খেয়ে ধর্মীয় বিষয়ক, সামাজিক বিষয়ক এবং অবসর যাপনের জন্য গান গেয়ে উঠেছে বারংবার।

তারিণী মাঝি, তবর-দি, জয়নদ্দি, তার স্ত্রী সকিনা, হরেন, কানাই, হরেনের স্ত্রী সিন্ধু, তারিণী মাঝির ছেলে রতন এরাই উপন্যাসে প্রধান চরিত্র এবং তাদের কাহিনি এগিয়ে নিয়ে গেছে ছড়া, ধাঁধা, লোকসংগীত, মিথ প্রভৃতি। এগুলি বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জয়নদ্দির মা সেই অঞ্চলের বয়স্ক মানুষদের মধ্যে অন্যতম। তিনি গ্রামে অনেক পুরোনো আমলের লোকগল্প বলেন। সেই সমস্ত গল্প সেই অঞ্চলের মানুষ আগে শুনে থাকলেও জয়নদ্দির মার বলার কৌশলে তা আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই লোকগল্পগুলি কখনো পৌরাণিক, কখনো বা সমাজ বিষয়ক হয়ে ওঠে।

জয়নদ্দি, কানাই ও তার বাবা মাহিন্দ একসঙ্গে নদীতে মাছ ধরতে যায়। নৌকায় তারা একসময় ক্লান্ত বোধ করলে সবাই মিলে নেশা করে। জয়নদ্দিও নেশা করে মনের আনন্দে প্রণয়গীত গেয়ে ওঠে।

মহাজন তবরদি একজন অসৎ মানুষ। সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে নিজের আখের গোছাতে বদ্ধপরিকর সে, এমনকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হরেন ও জয়নদ্দি হিসেবের খাতাতেও গরমিল করে বেশি পরিমাণ টাকা আদায় করে। জয়নদ্দি সেই

গরমিল ধরে ফেলে এবং খুশিতে শিক্ষামূলক গান গায়। সেই গানের ভঙ্গিমা জয়নদ্দি তরজা, পাঁচালি, কবিগানের থেকে পাওয়া।

উপন্যাসে হরেন সিন্ধুকে রূপকথা শোনানোর জন্য জোর করে। সে রাজার মেয়ে মালিনীর রূপকথার কাহিনি তার স্ত্রীকে শোনায়। অলৌকিকত্ব রূপকথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য— হরেনের রূপকথাতেও সেই অলৌকিকত্বের হদিশ মেলে। বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির এই উপাদানটি অতি প্রাচীন এবং অতিজনপ্রিয়ও বটে।

উপন্যাসে জেলে-মাঝিদের প্রাপ্য পাওনা মহাজনেরা কেবল নামমাত্র মেটায়। তারিণী মাঝির বি.এ পাশ করা পুত্রের চোখে এই অন্যায় একদিন ধরা পড়ে। সে বুঝতে পারে জেলে মাঝিরা হাড়ভাঙা খাটুনি করেও কেন তাদের অনটন শেষ হয় না? তাই সে ভাবে জেলেদের নতুন বখরায় প্রাপ্য মেটাতে হবে। তা না হলে তাদের এই সমস্যা কখনোই মেটানো সম্ভব হবে না। জয়নদ্দি এই নতুন নিয়মে মাঝিদের পাওনা মেটালে তবরদি তা একেবারেই মানেনি। তাই জয়নদ্দিকে উদ্দেশ্য করে প্রবাদ বলেছে— "ব্যাঙের টাকা হলে হাতিকে লাথি মারে।"[২৮]-এই প্রবাদটি ভিন্নভাবে অর্থনৈতিক দিকের ইঙ্গিত করে এবং এটা লক্ষণীয় যে এই নতুন ভাগের নিয়মটি 'তেভাগা' কৃষি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। রতন অনুভব করেছিল ধীবরদের অশিক্ষাই তাদের জীবনের সবচেয়ে বড়ো অন্তরায়। তাই সে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে এবং গ্রামের মানুষের সহায়তায় সে স্কুল করে। কলকাতা থেকে নিজের বন্ধুকে সেই স্কুল চালানোর দায়িত্ব আরোপ করে। স্কুল তৈরির পরে তবরদি তার লোকজনকে দিয়ে হরেনের স্ত্রী তথা সিন্ধুকে ধর্ষণ ও হত্যা করে। এরপর হরেন পাগল সেজে গ্রামের চরম শত্রু তবরদিকে বিনাশ করে এবং জেলেদের নতুন করে বাঁচার পথ দেখায়। উপন্যাসটি আঞ্চলিক

মানুষজনের মুখে স্থানের নাম, ব্যক্তি নামেরও বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। সেগুলিও বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে 'মায়ামৃদঙ্গ' (১৯৭২) উপন্যাসটি রচনা করেন। উপন্যাসটি মুর্শিদাবাদ জেলার অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকনাট্য 'আলকাপ' নিয়ে রচিত। 'আলকাপ' এর অর্থ সিরাজ তার উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণে জানিয়েছেন—"'আলকাপ' কথাটির প্রকৃত অর্থ: আমোদপ্রমোদমূলক নাটিকা। তবে কথাটির অর্থব্যঞ্জনা (conotation) বিস্তারে এই অর্থও—'রঙ্গরসাত্মক নাটিকা' বা 'রঙ্গব্যাঙ্গাত্মক নাটিকা।"[২৯] উপন্যাসে এই 'আলকাপ' দলের নেতা বা সম্রাট হলেন ঝাঁকসু বা ধনঞ্জয় সরকার আর সেই লোকনাট্যের প্রাণশক্তি হল 'ছোকরা'। পুরুষ তবু পুরুষ নয়, নারী তবু নারী নয়। জনৈক ব্যক্তি তাই বলেন— "তুই ব্যাটা ধরাধামে এক অ-ধরা।"[৩০] ঝাঁকসুর, ছোটবউ গঙ্গামণি বরের মুখে ঝাকসুর দলের ছোকরার কথা শুনে গুনগুন করে সামাজিক বিষয়ক গান ধরে—

"সই আমার গঙ্গাজল হে।"[৩১]

আবার দলের কঠিন সময়েও ছোকরা শান্তির গান গোটা দলকে প্রাণশক্তি যোগায়।

"আমার এ প্রথমো গান।"[৩২]

ওস্তাদ ঝাঁকসুর তিন স্ত্রী। গঙ্গামণি তার তৃতীয় স্ত্রী এবং সে তার সাধেরও বটে। গঙ্গামণির সঙ্গেই তিনি দিনযাপন করেন। তার দলের অন্যতম ছোকরা হল শান্তি। সে তার প্রাণের প্রিয়। গঙ্গার তীরে পড়ন্ত বিকেলে ধনঞ্জয় তার আদরের ছোকরা শান্তি ও তৃতীয় স্ত্রী গঙ্গামণিকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখতে পায়। তার চোখের সামনে দুইজন প্রিয় জনের এমতোবস্থায় দেখতে পেয়ে মানসিকভাবে চরম আঘাত পায়

ধনঞ্জয় সরকার। সেই সময় ধনঞ্জয় শান্তিকে ডাকলে শান্তি ভয়ে নদী সাঁতরে সে স্থান থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহে জানা যায় সেই রাতেই তাদের বড়ো রকমের আলকাপের বায়না থাকে। শান্তির অবর্তমানে সেই স্থানে কে 'বিরলমায়া' সৃষ্টি করতে পারবে— তা নিয়ে ধনঞ্জয় সরকার বেশ সন্দিহান ! শান্তিকে হারিয়ে ধনঞ্জয় সরকার ভেঙে পড়েন। তার দলে এর আগেও এই রকমের ঘটনা ঘটেছে। সুফল নামক ছোকরা পালিয়েছিল এরকমভাবেই। তখনও ঝাঁকসু মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। পরে শান্তিকে পেয়ে সেই অভাব আর কোনোদিন অনুভব করেনি ধনঞ্জয় সরকার। বৃদ্ধ বয়সে ধনঞ্জয় সরকার বন্যেশ্বরের মেলায় সামাজিক শিক্ষামূলক গান গেয়েছিন—

"(আমি) মানুষ দেখতে এসেছিলেন ভবে—
(আমার) এমন জনম আর কী হবে।"[৩৩]

ঝাঁকসু সম্রাট 'ছোকরা' শান্তিকে ছাড়াই মেলায় গান গাইতে আসে। তখন মেলায় গোপাল নামক অন্য এক ব্যক্তির আসর চলছিল। গোপালের দল সেই সময় সামাজিক বিষয়ক আলকাপের গান করে। গোপালের গানের ইতি হলে ঝাঁকসু সম্রাটের দল পালা শুরু করে। তিনি সেখানে রাজনীতি বিষয়ক গান করেন। ঝাঁকসুর তত্ত্বকথা বিষয়ক গান শুনে মেলায় উপস্থিত লোকজন বিরক্তবোধ করতে থাকলে, ঝাঁকসুর মন চাইনি স্থূল প্রকৃতির গান শোনাতে। কিন্তু সময় ও পরিবেশ মানুষকে বাধ্য করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে। তাই আসরে থাকতে ঝাঁকসুর কানে আসে তার তৃতীয় স্ত্রী বিষ খেয়ে মারা গেছে।

২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্তি পায়। এই উপন্যাস ১৯৭২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৭১ এর অনেক আগে এই

উপন্যাসের রচনা। তাই উপন্যাসে আলকাপের দল পদ্মার পাড়ে এলে পাকিস্তান সম্পর্কে আলোচনা করে। অনেক সময় সেই বিষয়ে ছড়া কাটে। এই পাকিস্তানকে নিয়ে কালীতলার বর্ডারে জাতি, ধর্ম, রাজনীতি বিষয়ক গান করে ওস্তাদ ঝাঁকসু। ওস্তাদ জলে নেমে তার দলের সদস্য ফজলকে বলে কোনোদিন যদি হিন্দু, মুসলমান হানাহানি লেগে যায় তাহলে কী করবে তারা। কেননা উভয়ে তারা ভিন্ন ধর্মের মানুষ। এই প্রশ্নের উত্তর ফজলের জানা ছিল না। তারপর ওস্তাদ সামাজিক বিষয়ক গান ধরে—

"আমার এমন জনম আর কী হবে।"[৩৪]

বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্যতম একটি উপাদান হল মন্ত্র। গুনিন প্রকৃতির মানুষ এইপ্রকার মন্ত্রকে দুইভাবে প্রয়োগ করে থাকেন। 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে এই গুনিন প্রকৃতির মানুষ দেখা যায়। আলকাপ দলের সঙ্গে অনেক সময় বয়স্ক গুনিন থাকে। তুক্‌তাকে তারা সিদ্ধপুরুষ। বিপক্ষ দলের তবলা ফাঁসানো, গায়কের গলাবসান, গান না জমানো প্রভৃতি বিষয় সিদ্ধ করার জন্য তারা মন্ত্র ছোঁড়ে। গ্রামীণ কথায় সে ব্যাপারটিকে 'বাণমারা' বলেও আখ্যা দেওয়া হয়।

উপন্যাসে অন্যতম আরও দুজন চরিত্র হল সনাতন মাস্টার ও সুবর্ণ। সে বীরভূমের আলকাপ দলের অন্যতম ব্যক্তি। সে আলকাপ দলে বাঁশিও বাজায়। বাঁশি বাজানো ছাড়াও গান গাওয়া তার অন্যতম শখ। সাঁওতাল পাড়ার উৎসবে ঝাঁকসু ওস্তাদের বিপক্ষে সে আলকাপ করে। সেখানে সে সামাজিক, ধর্মীয় বিষয়ক আলকাপ করে।

এছাড়াও উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানও ব্যবহৃত হয় (প্রবাদ, মিথ, ছড়া প্রভৃতি) এবং এগুলির বিষয়ও বহুমুখী।

বিশ শতকের সত্তর–আশির দশকের অন্যতম প্রতিভাশালী একজন লেখক হলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অন্যতম একটি উপন্যাস হল ‘গহিন গাঙ’। উপন্যাসটি সুন্দরবনের মালোপাড়ার পটভূমিকায় রচিত। এই মালোপাড়ার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বেলেগাঙ নদী। যার পোশাকি নাম বেতনা। এই মালোপাড়ার মৎস্যজীবীরা পেটের তাগিদে সুন্দরবনের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীতে মাছ ধরতে যায়। কিন্তু সেই জলে এবং ডাঙায় প্রতিমুহূর্তে চলে মৃত্যুর সঙ্গে খেলা। তাই বাড়ির পুরুষেরা মাছ ধরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে সেই বাড়ির সদস্যরা সবসময় ভীতসন্ত্রস্ত থাকে। উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে এরকম দুর্ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে তাদের জীবনে। তা সত্ত্বেও জেলেরা মাছ ধরতে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে না। মালোপাড়ার নিয়ন্ত্রক বলা চলে মহাজনদের। এইরকমই মহাজনদের মধ্যে অন্যতম মহাজন হল আবদুল। ইনি বিভিন্ন কৌশলে মৎস্যজীবীদের প্রাণের মূল্যে সংগৃহীত মাছ কম দামে বিক্রি করাতে বাধ্য করেন। দাদন নেওয়ায় মৎস্যজীবীরা ইচ্ছামত যে-কোনো জায়গায় তাদের মাছ বিক্রি করার ক্ষমতা থাকে না। সেই মালোপাড়ার প্রথম শ্রীপদ ও মধু অন্যত্র মাছ বিক্রি করার সাহস দেখায়। কিন্তু কৌশলী আবদুলের কাছে তারা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং পুনরায় শ্রীপদ আবদুলের নৌকায় মাছ ধরতে যায়।

‘গহিন গাঙ’ উপন্যাসটি ‘মালো’ সমাজের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস। মালোজীবনকে নিয়ে এর আগে বহু উপন্যাস রচিত হয়েছে এবং প্রতিটি উপন্যাসেই তার বিচিত্র প্রকাশ, যেমন—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’, অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, আব্দুল জব্বারের ‘ইলিশমারির চর’, সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’, মনোজ বসুর ‘জলজঙ্গল’ প্রভৃতি। উপরোক্ত প্রায় সব

উপন্যাসেই বিশেষত 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ তিতাস পাড়ের মালো জীবনের সংস্কৃতি, তাদের আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার তাদের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত হয়েছে। 'গহিন গাঙ' উপন্যাসটিতেও উঠে আসতে দেখা যায় মালোজীবনের অনুপুঙ্খ বিবরণ। তবে এ মালো সমাজের অবস্থান পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রের দক্ষিণ দিকে। জল আর জঙ্গলে ঘেরা উভয় সংকটের পরিসীমায়। যে চিত্র দেখা যায়, মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে। তেমনি 'গহিন গাঙ' এর পরিক্রমায় দেখা যায়, জল আর জঙ্গলের ঘেরাটোপে, অভাবক্লিষ্ট দারিদ্র্য পীড়িত মালোসমাজের ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক অবস্থানকেও। এ উপন্যাসে 'মালো' সমাজের এ হেন অবস্থানগত দিকটিও যেমন পরিস্ফুট, তেমনি সাংস্কৃতিক দিকটিও। 'গহিন গাঙ' উপন্যাসের এমনই বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির আত্তীকরণের দিকটি এ আলোচনার অভিমুখ। উপন্যাসে, মালোসমাজের নিজস্ব কিছু লোকসংস্কৃতি উঠে আসতে দেখা যায়। উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। এই প্রবাদের মারফতেই লেখক উপন্যাসের মূল ঘটনার আভাস দিতে চেষ্টা করেন—"বায়ের আগে বার্তা ছোটে।"[৩৫] এই প্রবাদের মাধ্যমে লেখক জানান সুন্দরবনে ললিত মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের মুখে প্রাণ হারায়। কিন্তু সুন্দরবন জঙ্গলে আকীর্ণ বলে সেই বার্তা অনেক পরে মালোপাড়ায় পৌঁছয়। রাস্তার ধারে দয়াল খুড়োকে যখন শ্রীপদ তার বাবার মৃত্যুর খবর বলে তখন তার মাও সেই কথা শুনে ফেলে। প্রিয়জন হারিয়ে ননীবালা কান্না জুড়ে দিলে সেই গাঁয়ে অন্য এক বিধবা মহিলা তাকে হাত ধরে একটি সামাজিক প্রবাদ বলে—"কপাল কেউ খণ্ডাতে পারে না।"[৩৬] দয়ালের মর্মান্তিক মৃত্যু পাড়ার চায়ের দোকানেও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়। চায়ের দোকানদার ঈশ্বর এই প্রসঙ্গে দার্শনিক বাক্য বলে— "জীবন নাকি পদ্মাপাতায় জলের মতো; এই আছে এই

নেই!”[৩৭] আপাত-সাধারণ সহজ সরল এ বাক্যে ধরা পড়েছে জীবনের গভীরতর ব্যঞ্জনা। উপন্যাসে শ্রীপদর স্ত্রী কড়ির দীর্ঘদিন সন্তান না হওয়ায় পাড়ার লোক তাকে ‘আঁটকুড়ি’ আখ্যা দিয়েছে। সন্তান জন্ম দিতে না পেরেও তার স্বামী তাকে খুব ভালোবাসে। তাই পাড়ার বউরা তাকে বিদ্রুপ করে সামাজিক প্রবাদ কাটে— “বউয়ের রূপ কাঁখে, নদীর শোভা বাঁকে।”[৩৮]

বস্তুত সমাজের প্রচলিত ধারণা মা না হতে পারলে নারীর জীবনের পূর্ণতা নেই। আর শুধু তাই নয়, মালো সমাজের সংস্কার সংসারের স্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা শুধু বংশবৃদ্ধিতে। এ হেন প্রচলিত ধারণার সঙ্গে খাপ খায়নি শ্রীপদর বউয়ের। নিঃসন্তান থাকা এবং তা সত্ত্বেও তার স্বামীর ভালোবাসার প্রাপ্তি। এমনতর বিপরীত ধারণার সমাজ অভিজ্ঞতার ধারক এবং বাহক এ প্রবাদটি। এছাড়াও উপন্যাসে আরো অনেক প্রবাদ, লোকসংগীতের প্রয়োগ দেখা যায়।

সুন্দরবনের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য মৃত্যু সেখানে সহজলভ্য। সুন্দরবনের সেই সমস্ত অঞ্চল ‘জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ’-এর মতো অবস্থা। তাই উপন্যাসে মালোপাড়া ‘বিধবাপল্লী’ নামে চিহ্নিত। যদিও জীবনবাস্তবতা-বোধের জন্য পরের দিনই তারা আবারও সেই জঙ্গলে মাছ ধরতে যেতে বাধ্য হয়। মৃত পরিবার সেদিন গান বাজনা করে, মনে শান্তি আনার চেষ্টা চলে ধর্মীয় বাতাবরণে। শ্রীপদর বাড়িতেও ধর্মীয় গানের আয়োজন করা হয়—“গাছের ফল গাছে রইল/বটু গেল খইসা/. . .দয়াল গুরুরে।”[৩৯]

এ গানে রয়েছে সামাজিক জীবনাভিজ্ঞতা। তেমনি জীবনের এই উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে ওতপ্রোত তাদের সহজাত লোকগান। মৎস্যজীবীরা সারাদিন অমানুষিক

পরিশ্রম করে। আর তার অবসর যাপনে গলা বেয়ে উঠে আসে—"মনের জ্বালা মোর জুড়োয়ে দিলি না, ও কালা।"[৪০] গান যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান কিংবদন্তি। উপন্যাসে দয়াল খুড়োকে কেন্দ্র করে পৌরাণিক কিংবদন্তি ব্যবহার করা হয়েছে। দয়াল মালোপাড়ার প্রাচীন ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম একজন। এককালে তিনি নামজাদা 'সাঁইদার' ছিলেন। মোহনায় মাছ মেরেছেন। যেখানে জঙ্গলের শেষ, কেবল উঁচু উঁচু নলঘাস আর মস্ত সিং ওয়ালা বাছুরের মতো হরিণ সেই জঙ্গলে তিনি জীবনে দু-বার বনবিবির দেখা পেয়েছেন এই কাহিনি পাড়ায় প্রচারিত এবং প্রচলিত।

সুন্দরবনের মালো সমাজে 'দানো'র ভাবনা দীর্ঘদিনের। সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসেও আমরা এই দানোর উল্লেখ পাই। 'গহিন গাঙ' উপন্যাসে 'দানো' সম্পর্কে যে কিংবদন্তি রয়েছে—

"সুযোগ পেলে জলের দানো নাকি জেলেদের নৌকো ডুবিয়ে দেয়। গাঙের জল ফুলে ওঠে। ঢেউ নাচতে নাচতে আকাশ ছোঁয়।"[৪১]

এ হেন কিংবদন্তির সত্য-মিথ্যার যাথার্থতা যাচাই অন্যতর সমীক্ষার বিষয়। তবে গল্পে শোনা এবং বলার যে অভ্যেস তা তো বহু আদিম। কিংবদন্তিগুলি যেন সেই পুরাতন অভ্যেসের ধারক-বাহক। এ সমস্ত কিংবদন্তি শুধু গল্প পিপাসু মনের চাহিদা মেটাতেই সক্ষম নয়, উপরন্তু, সে সকল বর্ণিত গল্পের মাধ্যমে উপন্যাসে মালো সমাজের সংস্কার বা বিশ্বাসের চিত্রটিও প্রতিফলিত হয়। যা কিছুর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, সেখানে কল্পনা-বাস্তব মিলেমিশে রহস্যময়তার আবরণে তৈরি হওয়া গল্প যেমন লোকসমাজের ঐতিহ্যকে ধরে রাখে, তেমনি সেসব উপাদান উপন্যাসে বর্ণিত হয়ে উপন্যাসের কাহিনি বস্তুকে বা ঘটনার

অভিমুখকে অগ্রসর হতেও সাহায্য করে। আর সর্বোপরি লোকসংস্কৃতির উপকরণগুলিকে উপন্যাসে অঙ্গীভূত করে, বা কোনো বিশেষ সমাজগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতিকে যথাযথভাবে তুলে ধরে সেই সমাজ সম্পর্কিত একটি সামগ্রিক ধারণা গড়ে তোলা দুঃসাধ্য একটি বিষয়। এক্ষেত্রে 'গহিন গাঙ' নামক স্বল্পায়তন উপন্যাসটির আধারে বাক্‌কেন্দ্রিক কিছু লোকসংস্কৃতির পর্যালোচনা সেখানকার 'মালো' সমাজের অশিক্ষা, দারিদ্র্য, সংস্কার, বিশ্বাস, প্রচলিত প্রথা— এককথায় সামগ্রিকতা জানা যায়। 'গহিন গাঙ' এর স্বল্পায়তনে সেই সামগ্রিকতার গহিনতাই ধরা পড়েছে যেন।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'মহিষকুড়ার উপকথা' (১৯৮১) একটি স্বতন্ত্র স্বাদের উপন্যাস। হ্রস্বায়তন এই উপন্যাসটি গতানুগতিক আখ্যানের থেকে স্বতন্ত্র। 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসের নামকরণের দিকে লক্ষ করা যেতে পারে যা অভিনব। এখানে 'উপকথা' শব্দটির অর্থ জানার চেষ্টা করা যেতে পারে। সুকুমার সেন বলেছেন সংস্কৃত শব্দ ধরলে এর মানে অবান্তর। আবার বঙ্কিমচন্দ্র ছোট কাহিনি অর্থে উপকথা ব্যবহার করেছেন। লোকসংস্কৃতির কোষগ্রন্থ বলে পশুপাখিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কাহিনি উপকথা বলা হয়। উপকথার উদ্দেশ্য কৌতুকরস সৃষ্টি করা। লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন উপকথায় পশুর পাশে মানুষ থাকতে পারে এবং উপকথার আশ্রয় অনুন্নত, অন্তেবাসী মানুষ।

'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসের প্রথমেই অমিয়ভূষণ অরণ্যবেষ্টিত একটি গ্রামের প্রসঙ্গ আনেন— সেই গ্রামই এ উপন্যাসের নায়ক। সেই গ্রামের একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী ও তাদের জীবনযাপন উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। উপন্যাসে

পশু ও মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে। কখনো কখনো উপন্যাস উপকথায় মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়, এবং তাতে দেব-দানব, ভূত-প্রেত বর্তমান থাকে— এসব বিষয়নির্ভর রচনা উপকথার সার্থকতা প্রমাণ করে। উপকথায় অলৌকিকতা, মিথ প্রভৃতি মিলে মিশে থাকে। উপন্যাসেও সেই মিথ বা কিংবদন্তি দেখতে পাওয়া যায়। উপন্যাসে ঔষধ আনতে শহরে যাবার পথে আসফাকের পিছনে লেগেছিল অপদেবতা 'ভুলুয়া'। জনশ্রুতি আছে যে, এই 'ভুলুয়া' মানুষের মন ভুলিয়ে সঠিক রাস্তা ভুলিয়ে দেয়। উপন্যাসে 'ভুলুয়া' মারাত্মক অপদেবতা। সে তার বীভৎস চেহারা নিয়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-য় এই রকম অপদেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

অভিজিৎ সেন 'রহু চণ্ডালের হাড়' (১৯৮৫) নামক উপন্যাসটি আত্মকথার ঢঙে বাজিকর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিচিত্র তথ্য উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসে লেখক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন কথা তুলে ধরেছেন। তথাকথিতভাবে যাদের সমাজে 'বাজিকর' বা 'বাদিয়া' বলে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। উপন্যাসটি বাজিকরদের পূর্বপুরুষ, তাদের ইতিহাস ও পুরাণ মিলে মিশে এক জটিল বাস্তবতার মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে। উপন্যাসে এই 'বাদিয়া' বা 'বাজিকর'দের পূর্বপুরুষ বা আদিপুরুষ হল 'রহু'। বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে, এই 'রহু' তাদের পৌরাণিক চরিত্রও বটে। উপন্যাসে বারংবার তার আভাস দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত এই রহুর বংশধরদের তিন-চার পুরুষের বিবর্তনের পর উপন্যাসের এই চরিত্রদের আগমন, (উল্লিখিত বংশধরদের)। 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাস মিথের আবহে গোটা আখ্যানটি নির্মিত। মূলত যাযাবর মানুষের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

উপন্যাসে লুবিনি নাতনি শারিবাকে গল্পের ছলে বাজিকর সমাজের ইতিহাস বলেছে। একদিন আগন্তুকরা রহু ও তার অনুগামীদের, তাদের পবিত্র নদী, বন ভূখণ্ড দখল করলে রহু সেই আগন্তুকরা বাধা দিতে আসলে রহুর মৃত্যু ঘটে। রহুর মৃত্যুর পর থেকে বাজিকরদের যাযাবর জীবনের পথচলা এবং পুরা ও পলির বিবাহজনিত অভিশাপও বাজিকরদের যাযাবর জীবন-যাপনের অন্যতম কারণ। কেননা পুরা ও পালি উভয়ে সম্পর্কে বোন বলে প্রচারিত। লোকসমাজের 'টোটেমে'র ধারণায় বিপক্ষে যায় এই দু-জনের বিয়ে। 'টোটেম'-এ বলা হয় যে, স্বজাতি বা রক্তের সম্পর্কে বিবাহ অনিয়ম বা স্বজাতিতে যৌন সম্ভোগ করা নিষিদ্ধ। তাই উপন্যাসে বলা হয়—

"পুরা ও পালির বিয়ে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবতার অভিশাপ নেমে আসে তাদের উপর। অন্তর্কলহে সমস্ত মানুষ নষ্ট হয়। পুরা ও পালি দেশ-দেশান্তরে পালিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। তারা কোথাও আশ্রয় পায় না এবং দেবতা তাদের অভিশাপ দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় করে দেয়। তোমরা এক বৃক্ষের ফল দু-বার খেতে পারবে না। এক জলাশয়ের জল দু-বার পান করতে পারবে না, এক আচ্ছাদনের নিচে একাধিক রাত্রি বাস করতে পারবে না এবং সব থেকে ভয়ানক—এক মৃত্তিকায় দু-বার নৃত্য করা দূরে থাকুক, দু-বার পদপাত পর্যন্ত করতে পারবে না। এই ছিল দেবতার অভিশাপ। সেই থেকে বাজিকর পথেপ্রান্তরে ঘুরছে।"[৪২]

বাজিকরেরা জানত যে তাদের এই সংকটপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে রহুর মন্ত্রপুত হাড়ের প্রয়োজন। আর সেই হাড় কোনো ফলপ্রসূ মৃত্তিকার গভীরে লুকিয়ে রয়েছে যা খুঁজে পেলে বাজিকরদের দুর্বিষহ যাযাবর জীবনের অবসান হয়তো বা সম্ভব।

'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসের অন্যতম মূল ভিত্তি হল মিথ। বলা চলে গোষ্ঠী-

জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের অন্যতম উপাদান হল এই বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির যেহেতু কোনো লিখিত ঐতিহ্য থাকে না তাই, মিথ, কিংবদন্তি, লোকশিল্প প্রভৃতি তার ভরকেন্দ্র। এই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির উপর ভিত্তি করেই পরিশীলিত সাহিত্য নির্মিত হয়। এবং একথাও স্বীকার্য, লোকসাহিত্য বিষয়ক রচনা পাঠই পরিশীলিত সাহিত্যের যথাযথ পাঠকে সম্ভব ক'রে তোলে। ঔপন্যাসিক তাই বলেন—

"আমি লোককথায় আখ্যান উপন্যাসকে নানা ভাবে বিন্যস্ত করি। আখ্যানের অংশ, আখ্যানের চরিত্র, গান ছড়া মঙ্গলকাব্য—তার রহস্যময় বাস্তবতা, যা আমাদের প্রকৃত মানুষের চরিত্রকে ধরতে বুঝতে ভীষণভাবে সাহায্য করে, এসবও আমি উপন্যাসে আনি। . . . সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিন্যাসকে বুঝতে সাহিত্য যদি কিছু সাহায্য করে তাহলে লোকজীবন, লোককথা, মিথ, মন্ত্রবাণ ইত্যদির সঙ্গে এখন পর্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত মানুষকেই খুঁজতে হবে,. . . আমি এসব বিষয় ও সেই বিষয়-আশ্রিত যোগ্য আঙ্গিকটিকেই আমার কিছু গল্প উপন্যাসে খুঁজতে চেষ্টা করেছি।"[৪৩]

আলোচ্য উপন্যাসটিতে বাজিকরেরা প্রথম থেকেই সমাজতাড়িত। রহু সেই সমাজ তাড়িতদের মঙ্গল চায়। তাই বাজিকরের যাতে স্থিতি পায় তার জন্য সমাজে সবাই নিজের মতো করে ভাবনা চিন্তা করে। তাই বাজিকরেরা যে কোনো বিপদে রহুকে স্মরণ করে। রহুর মাটিতে প্রোথিত হাড় খোঁজ করে চলে। কেননা, দনু পীতেমকে বলেছে, যে নদীতে তোমার পিতৃপুরুষ বাস করেছে সেরকম নদী কেউ দেখেনি, সে রকম জাত আর দেখতে পাওয়া যায় না এবং দনু এও বলেছে সেই জাতের মানুষ যে গান গাইত সেই সম্পদের কোনো তুলনা হয় না। রহু তার দলের মানুষদেরকে নিয়ে সেইরকম একটা সমাজে বসবাস করত। সেই সমাজে বনের অফুরন্ত শিকারী পশু, মাঠে অজস্র শস্য মানুষ সর্বত্র সুখী জীবন-যাপন করত। কিন্তু

হঠাৎ সেই সমাজে একদিন বিবাদ দেখা যায়। এই থেকে সেই সমাজে অশান্তির সূত্রপাত এবং স্থিতির খোঁজে চলে তার অন্বেষণ। উপন্যাসে রহুকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মিথের বলয়ে উপন্যাসটির আখ্যান পল্লবিত হয়েছে। মিথ ছাড়াও উপন্যাসে প্রবাদ, সংগীত প্রভৃতি বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এবং তার বিষয়ের অভিনবত্ব নজর কাড়ে।

বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় অনিল ঘড়াই আরও এক নতুনত্বের সংযোজনকারী। তাঁর সাহিত্য সম্ভারের অধিকাংশই বলা চলে শ্রমজীবী, মেহনতি মানুষদের নিয়ে রচিত। তাঁর রচনায় বেশি মাত্রায় গুরুত্ব পেয়েছে গ্রামীণ মানুষদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, তাদের দৈনন্দিন জীবনের চালচিত্র, সামাজিক অবক্ষয় প্রভৃতি। তাঁর রচিত অন্যতম একটি উপন্যাস হল 'নুনবাড়ি (১৯৮৯)। যেটি লেখকের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। তেরোটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই উপন্যাসটি নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু হয়েছে—"বুক ভেঙ্গে গেলে মুখেও তার ছায়া পড়ে।"[৪৪] লবঙ্গ নামক এক গৃহবধূ শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। তার বর কালাচাঁদ অন্য একজন মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় লবঙ্গের প্রতি তার ভালোবাসা এখন ফিকে। দায়িত্ব নিতেও সে পিছুপা। শ্বশুরবাড়ির লোকের কাছে সে অসহনীয়। ফলে ভালোবাসাহীন বাসায় থাকার কোনো কারণই লবঙ্গ খুঁজে পায় না। লবঙ্গের বিয়ের সময় কালাচাঁদকে পণ হিসেবে বাইক দেবার কথা ছিল। কিন্তু কার্যসময়ে সেটা দেওয়া হয়নি। লবঙ্গের বাবার সেই অপরাধের মাশুল লবঙ্গকেই দিতে হত প্রতি মুহূর্তে। লবঙ্গকে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোক প্রতিমুহূর্তে অত্যাচার করেই ক্ষান্ত হয়নি। ননদের বিয়ের সময় তার বাবাকে আবার সেই পাওনা বাইক দেবার কথা বলে। কিন্তু লবঙ্গের বাবা জটায়ু গরিব মানুষ, সোজাসুজি বলে দেয় তাকে বেচলেও মোটর

সাইকেলের দাম দেবার টাকা হবে না। এই নঞর্থক উত্তরে লবঙ্গের যা ভবিতব্য ছিল তাই হয়েছে। সবার চক্ষুশূল হতে হয়েছে। এমনকি শাশুড়ি ছেলেকে উপদেশ দিয়েছে লবঙ্গকে মেরে ফেলতে। লবঙ্গ শ্বশুর বাড়ির অকথ্য নির্যাতন সইতে না পেরে একমাত্র সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসে। এদিকে অসহায় দরিদ্র বাবা মেয়ে বাড়ি ফেরায় খুশি হতে পারেনি। কারণ বাবা জটায়ু নিজের সংসার টানতে এমনিতেই নাজেহাল, তার উপর দুটো পেট। বাবার কথা মাথায় রেখে লবঙ্গ নিজেই সংসার চালানোর দায়িত্ব নেয়। অন্যদিকে লবঙ্গের স্বামী অন্য জায়গায় বিয়ে করে। লবঙ্গের জন্যই সে তার কাঙ্ক্ষিত মেয়েটিকে এতদিন বিয়ে করতে পারছিল না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা যেন পুরুষদের হাতের পুতুল। কেননা কালাচাঁদের মতো অর্থলোলুপ ব্যক্তি এ সমাজে সহজলভ্য।

উপন্যাসের আখ্যানে আছে বহু পুরাতন সামাজিক ব্যাধি পণপ্রথার প্রতিচ্ছবি। নিতান্তই সহজ সরল এই আখ্যানের গড়ন। চেনা চরিত্র, চেনা ঘটনা, পরিচিত সমাজপ্রেক্ষিত। শুধু যেন সমাজ বাস্তবতার এই খণ্ডটুকু প্রকাশে চরিত্রগুলির নাম পরিবর্তিত। তবে এ যেন 'গল্প হলেও সত্যি'। চেনাজানা জীবন প্রেক্ষিতে নিম্নবিত্ত পরিবারের অর্থাভাব, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার সামাজিক বিধিবদ্ধতা এবং অনুশাসনের কারণে পেটে ভাত না জুটলেও কন্যার বিয়ে দিতে হয় পণের বিনিময়ে। পণরক্ষা করতে না পারায় শ্বশুরবাড়িতে নারীর অবশ্যম্ভাবী অপমান, লাঞ্ছনা, অপদস্থতা। সর্বোপরি পৌরুষের অহংকারে দ্বিতীয়বার বা একাধিকবার 'বিবাহ' নামক প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো কোনো পুরুষের ভিন্ন স্ত্রী বা নারী নির্বাচন। আর নারীর নিষ্পেষিত দাম্পত্যের অভিজ্ঞতা স্বরূপ প্রাপ্ত বা আগত সন্তানের দায় অবহেলিত হয়।

ঔপন্যাসিক উপন্যাসে পরিচিত চরিত্র, পরিচিত পরিস্থিতিকে প্রকাশ করলেও চরিত্রের অবস্থানে স্পষ্ট করেন চরিত্রটির আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে। লাঞ্ছনা সহ্য না ক'রে শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার প্রবণতাটি একবিংশ শতাব্দীর পাঠকমনে খুব বেশি নজরকাড়া নয়। তবুও ১৮৯১-র রবীন্দ্রনাথের 'নিরুপমা' দেনাপাওনার হিসেবে মৃত্যুমুখী। আর কালের গতিতে 'লবঙ্গ' সেই তথাকথিত হিসেব-নিকেশের মধ্যেও লড়াই করবার যে মানসিকতাকে প্রকাশ করে, বেঁচে থাকবার যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়, তাকে সাধুবাদ জানাতে হয়। লেখক লবঙ্গের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন এমন এক সমাজ প্রেক্ষাপটকে, এমন সম্মিলিত বেঁচে থাকবার প্রয়াসকে, যা জীবনের অস্তিত্বের জন্য যে লড়াই তাকে উপস্থাপন করে। আপাত তুচ্ছ একটা বিষয় 'নুনবাড়ি'। পাঠক বিস্মিত না হয়ে পারে না জীবনের যে যাপন, তাতে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এই মৌলিক চাহিদা ব্যতীতও, ষড়রিপুর তাড়না ব্যতীতও আরও কিছুর প্রয়োজন থাকে। যে প্রয়োজনে জীবনের যাপন করা যায়। জঠরস্থ ক্ষুধা নিবৃত্ত করা যায়। নুন তৈরির প্রক্রিয়ার সঙ্গে জুড়ে থাকে কিছু মানুষের যাপন। যা আলাদাভাবে অভাবনীয়, অচিন্ত্যনীয় একটা ব্যাপার যে কিছু মানুষ খাবারের স্বাদ দ্বিগুণ করে দেবার প্রয়াসে, জীবনের স্বাদ বহুগুণ করে দেবার প্রয়াসে নুনের উপর নির্ভর করে। নুন নিয়েই সেই প্রবাদ 'নুন খেয়ে গুণ গাওয়া'র কথা প্রসঙ্গত মনে আসে। আরও মনে আসে সেই বহু প্রচলিত লোককথাটির, যেখানে এক রাজা তাঁর তিন কন্যাকে ডেকে জানতে চান, তাদের জীবনে তাদের বাবার গুরুত্ব কতখানি। রাজার প্রথম দুই কন্যাসন্তান রাজাকে তুষ্ট করেন আকাশের সঙ্গে, সাগরের সঙ্গে তুলনা ক'রে। তাতে রাজা ভীষণ প্রীত। এরপর তিনি কনিষ্ঠা কন্যার কাছে তাঁর গুরুত্ব জানতে চাইলে, সে উত্তর দেয়, খাবারে নুন না থাকলে খাবারের স্বাদ যেমন, রাজা অর্থাৎ পিতা না থাকলে তার (সেই

রাজকন্যার) জীবনও তেমন। রাজা এমন তুচ্ছ একটি বিষয়ের সঙ্গে তুলনায় রেগে গিয়ে কনিষ্ঠাকে বিতাড়িত করেন। ঘটনাচক্রে কোনো এক সময় কনিষ্ঠা কন্যার আশ্রিত হলে সে রাজাকে খেতে দেয় নুন ছাড়া খাবার। রাজা খাবার মুখে দিয়েই বিস্বাদের বিরক্তি প্রকাশ করেন। এ কি খাবার যোগ্য? নুন নেই যে ! কনিষ্ঠা পূর্বোক্ত কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পিতার ভুল ভাঙায়। (প্রচলিত)

উপরোক্ত লোককথাটিতে প্রকাশিত হতে দেখা যায়, জীবনের গূঢ়ার্থকে। সেই লোককথারই মার্জিত রূপের যেন প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়, 'নুনবাড়ি'তে। তাছাড়া একথা পূর্বেই কথিত যে, শিষ্ট সাহিত্যের ভিত্তি এই লোকসাহিত্য তথা লোকসংস্কৃতি। আলোচ্য উপন্যাসটিতেও এমন বেশ কিছু বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে সামাজিক প্রবাদের প্রয়োগ যদিও বেশি নজরে আসে। এছাড়াও আর্থ-রাজনীতি বিষয়ক প্রবাদের প্রয়োগও লক্ষ করা যায়, যা উপন্যাসটির সামগ্রিকতাকে প্রতিভাত করে।

ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি' (১৯৯৩) উপন্যাসটি 'বসু-শবর' সম্প্রদায়ের লোকজীবন নিয়ে রচিত। আর ঐ লোকজীবন নিয়ে লিখতে গিয়ে লেখক ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭) 'লোকসংস্কৃতি-প্রেমী' ফোক-ব্যবসায়ীদের আসল স্বরূপটি উন্মোচন করেছেন। কথাকার এখানে 'বসু-শবর' জনগোষ্ঠীর লোকজীবনধারাকে চিত্রায়িত করেছেন। বসু-শবরদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে নিয়ে যে ভালোবাসা অর্থলোভী রাজীব স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই সংস্কৃতিকে বাজারে নিয়ে আসতে দ্বিধাবোধ করেনি। নিজ স্বার্থের জন্য 'বসু-শবর' সংস্কৃতিকে পণ্য করতেও তারা পিছুপা হননি।

বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ, পাহাড় ডুংরী হয়ে দিনভর পথচলার পর পৌঁছানো যায় গজাশিমুল গ্রামে। জঙ্গল, ডুংরী, পাহাড়ের মধ্যে বাস সেখানকার মানুষের। তাঁরাই এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্র। বাইরের তথাকথিত ভদ্রলোককে তারা ভয় পায়। আড়ালে তাদেরকে 'কাঁকড়া' বলে সম্বোধন করে। রঙলালকেও তারা প্রথমে ভয় করত এবং ধীরে ধীরে তারা রঙলালকে বিশ্বাস করতে থাকে। এই রঙলালই প্রথম তাদের বাইরে রঙিন স্বপ্নের হদিশ দেয়।

রাজীব শহুরে শিক্ষিত বাঁকুড়া কলেজের অধ্যাপক। তথাকথিত লোকসংস্কৃতি-প্রেমী এই ব্যক্তি চেয়েছিল লোকসংস্কৃতির পূজারী হতে। অ-শিক্ষিত মানুষগুলোকে তার হাতের ঘুঁটি করে নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়েছে। তার বাহ্যিক দিক ছিল নিষ্ঠাবান সংস্কৃতিপ্রেমী, কিন্তু অন্তরে ছিল নিজ স্বার্থ সন্ধানী ঘুঘু মানসিকতা। রাজীবের বান্ধবী সুতপা। চাকরি সূত্রে সে অন্যত্র চলে গেলে বিদেশিনী মিস ক্যাথি বার্ডের সঙ্গে তার সখ্য গাঢ় হয়। মিস ক্যাথিবার্ড 'ইস্ট-ওয়েস্ট ফোক ফাউণ্ডেশান'-এর ইস্টার্ন জোনের ডিরেক্টার হিসেবে বর্তমানে রাজীবের লোকসংস্কৃতি চর্চার সঙ্গী।

উপন্যাসে রঙলালকে রাজীব সহ্য করতে পারে না, প্রতিযোগী সত্তার দরুণ। একই কারণে নীল নয়না বিদেশি ক্যাথিবার্ডকে সহযোগী সত্তা ভেবেছেন। এই বিদেশিদের কাছে গোটা বিশ্বই 'পিকনিক স্পট'। নয়া উপনিবেশবাদের ফলে গড়ে ওঠে 'গজাশিমূল সংস্কৃতি সংঘ'। তারা কলকাতা, দিল্লী, বেনারস প্রভৃতি অঞ্চলে নিজেদের নিজস্ব সম্পদকে প্রদর্শনীতে পরিণত করেছে। তার ফলস্বরূপ প্রাপ্তি হয়েছে মেডেল, বোদ্ধাজনের পিঠ চাপড়ানো এবং সরকারী অর্থানুকূল্য। আর রাজীবের কপালে জুটেছে ব্লু-বার্ড পাবলিকেশনের আন্তর্জাতিক বাজারের বাণিজ্য,

বিদেশের সেমিনারে যোগ দেবার সুযোগ। সর্বোপরি বিরাট অঙ্কের অর্থের ছোঁয়াতেই তারা আড়কাঠিতে পরিণত হয়। এটিই 'আড়কাঠি' উপন্যাসের পটভূমি।

'আড়কাঠি' উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে লোকসংস্কৃতি। তাই এখানে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি খুব সহজেই নজরে আসে। কথাকার মিথ, কিংবদন্তি, প্রবাদ, লোকসংগীত প্রভৃতির মাধ্যমে উপন্যাসের প্রাণের স্পন্দন অনেক সজীব করেছেন এবং উপন্যাসে ব্যবহৃত বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির বিষয় আলাদা আলাদা। কোনোটি রাজনৈতিক, কোনোটি সামাজিক আবার আর্থ-সামাজিক বা পৌরাণিক বিষয় নিয়েও রচিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রথম দিকে একটি সংগীত পরিবেশিত হয়েছে। যে গানটি গুমো প্যাসেঞ্জারে উপস্থিত ট্রেনযাত্রীদের অবস্থানকে চিহ্নিত করেছে। নিতান্তই সেটি বিনোদনের উদ্দেশ্য পরিবেশিত, উপন্যাসের প্রথম দিকে দুটি বাউল গান পরিবেশিত হয়েছে। খড়গপুর স্টেশনে বাউল উদাত্ত সুরে গান ধরেছেন। সেই গানে জীবনবোধ বেশি করে ধরা পড়েছে। বাউল গান মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার গান। এই গানে রূপকের মাধ্যমে মানুষের জীবনবোধ উঠে আসে। বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংগীতের গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম এটি।

গজাশিমূল গ্রামের মানুষ, যারা আসামের চা বাগানে গিয়েছে তারা যে স্বর্গীয় আনন্দে সেখানে আছে, তার প্রমাণ হিসেবে সেই গ্রামের মানুষদেরকে চিঠি দেখায় রঙলাল। রঙলাল চিঠি দেখে গজাশিমূল গ্রামের মানুষ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে। কেননা গজাশিমূল গ্রামে মানুষ সুখে নেই। খাদ্যাভাবে তাদের দিন চলে। কিন্তু কৌশলী রঙলাল তাদের মিথ্যা লোভ দেখায়। এই প্রসঙ্গে একটি গান পরিবেশিত হয়েছে। তাতে ধরা পড়েছে তাদের কষ্টের দিনলিপি। এছাড়া টুসু, ভাদুগনের প্রসঙ্গও উপন্যাসে উঠে এসেছে।

উপন্যাসে 'মায়ের দয়া' থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গ্রামের গোষ্ঠী-মানুষ লৌকিক দেবী শীতলার পূজা করেছে। পূজার সঙ্গে তিনদিন তিনটি পালাগান করে তারা। প্রথম রাতে 'শীতলা বন্দনা' উপস্থাপন করে, দ্বিতীয় রাতে 'শিকার-লাচ', তৃতীয় রাতে 'চাঙ-লাচ' পরিবেশিত করে। প্রথম রাতে শীতলা-বন্দনায় বিচিত্র সুরে গান, বন্য তালে বাজনা, নিজেরাই শীতলা সেজে দেবীর বাহন সেজে এমনকি রোগ-জীবাণু সেজে নাচগান করে। সমস্ত কিছুতেই নিজস্ব ছোঁয়া। স্বতন্ত্র ঘরানার জিনিস সেই অনুষ্ঠানে দেখা যায়। গজাশিমূলের সরল মানুষগুলি জানে না যে কী ঐশ্বর্য নিয়ে বসে আছে তারা। ঔপন্যাসিক অন্য চরিত্রের মুখ দিয়ে জানিয়েছে যে তারা 'বিহা গীত', 'পরবের গান', 'আষাঢ়িয়া গান'ও করে থাকে।

উপন্যাসে আষাঢ় মাসের সাত তারিখে 'অম্বুবাচী'। রাঢ়ের মানুষ জানে ঐ দিন ধরিত্রী ঋতুমতী হয়। সেদিন কাঁচা দুধ পাকা আম খেয়ে চাষীরা হাল, বলদ নিয়ে মাঠে রওনা দেয়। এটি একটি লোককাহিনি যা গজাশিমূলের মানুষ পালন করে। এই অনুষ্ঠানে তারা গান করেন—

"দ্যাশ জুইড়্যে খরা হইল্যাক,
দারুণ খাটারশাল হে—"[৪৬]

এই গানের মধ্য দিয়ে বাঁকুড়া জেলার ভৌগোলিক দিকটিও সূচিত হয়। উপন্যাসে কাস্তে মল্লিক, বাবা কানাইশরের লোকগল্প বলেছেন। ন্যায়-অন্যায়ের উপদেশ হিসেবে এই লোকগল্প বেশ গুরুত্বপূর্ণ তাদের কাছে। কেননা কানাইশর জীউর মহিমা ভালো লোকের পক্ষে খুব সৌভাগ্যের এবং মন্দ লোকের জন্য দুঃখের হয়ে থাকে। তার শারীরিক অবয়বও বৃহৎ। এই বর্ণনার মধ্যে লোকগল্পের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়।

গোষ্ঠীজীবনে মন্ত্র-তন্ত্র একটা বড়ো জায়গা জুড়ে থাকে। ব্ল্যাকম্যাজিকও তার থেকে বাদ দেওয়া যায় না। ব্ল্যাকম্যাজিকের কুফলে গরুর বাটে দুধ থাকে না। গাছের ফল শুকিয়ে যায়, পুকুরে মাছ উবে যায়, মানুষের শরীর শুকিয়ে সুতোর মতো হয় বলেও লোকমানুষের ধারণা। এই রকম ব্ল্যাকম্যাজিক বা কালাযাদু বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্যতম একটি অঙ্গ। প্রাচীনকালে শত্রুনিধনের জন্য এই বিদ্যা প্রয়োগ করার চল ছিল। শুভকারী মন্ত্র, অ-শুভকারী মন্ত্র ব্ল্যাকম্যাজিক দুটি বিদ্যাতেই দেবতাকে তুষ্ট করার বিষয় লক্ষ করা যায়। দেবতাকে তুষ্ট করেই এই বিদ্যা রপ্ত হয়।

রাজীবের লোকসংস্কৃতিচর্চার সূত্রে উপন্যাসের পটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে 'বসু-শবর' জনগোষ্ঠীর ভিতরকার 'ট্যাবু' এবং 'টোটেম' এর বিচিত্র ও বিশিষ্ট রূপটি। জলকেলি 'বসু-শবর'দের একেবারে আপন অন্তরের জিনিস। তাকে তারা মনের ভেতরে লালন করে, প্রকাশ্যে বলাও পাপ বলে মনে করে। 'বসু-শবর'দের একজন তার দুর্বল মুহূর্তে রাজীবকে সেই কাহিনি বলে— "বুঝলে হে মাস্টার, এই সব চিজ দেখতে চাওয়াও পাপ। দেখানোও মহাপাপ।"[৪৭] তাদের 'ট্যাবু'কে রাজীব ভেঙে দিতে ফন্দি আঁটে। এই 'জলকেলি' নাচের মধ্যে একটি ধর্মীয় মিথ আছে, সেটা একান্তই 'বসু-শবর' জনগোষ্ঠীর। বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির এই মিথটি অভিনব এবং তাতে তাদের আধ্যাত্মিকযোগ রয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে 'শবর চরিত' স্বতন্ত্র ধারার উপন্যাস। সাতের দশকে 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শবর পুরাণ' উপন্যাসটিই নতুন কলেবরে 'শবর চরিত' হিসেবে

পরিচিত। এর প্রথম পর্ব ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত। গবেষণার সময়কালের প্রেক্ষিতে (বিশ শতক অর্থাৎ ২০০০ সাল) এ উপন্যাসের মূলত প্রথম পর্বটিই শুধু আলোচনায় রাখা হয়েছে।

শবরেরা দুই শ্রেণির। খেড়িয়া শবর এবং লোধা শবর। লোধা শবরদের নিয়ে এই উপন্যাস রচিত। শবরেরা উচ্চবর্গের ক্ষমতার চাপে তটস্থ হয়ে চলেছে। যদিও ১৮৭১ সালে গেজেটিয়ারে ইংরেজরা লোধা শবরদের 'অপরাধপ্রবণ জাতি' বলে চিহ্নিত করে। ভোটবাক্সের দৌলতে আজ তারা অনেক খানি মর্যাদাসম্পন্ন। যদিও আদপে তারা প্রান্তীয়ই থেকে গেছে।

নলিনী বেরার (১৯৫২) 'শবর চরিত' প্রথম পর্বের পটভূমি মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল। কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে রাইবু। চুরি শবরদের অন্যতম জীবিকা। কিন্তু অন্য উপজাতি বা গোষ্ঠীরা চুরি করলেও চুরির বদনাম শুধু তাদেরই। এটাই নিয়তি। তাই রাইবুর বাবা বলে— "চুরি হৈল যথাতথা, চোর টুঁড়তে লোদ্ধাপাড়া।"[৪৮] চুরির অভিযোগে সমাজ কর্তৃক যুগ যুগ ধরে অভিযুক্ত লোধাদের অভিজ্ঞতা লোকপ্রবাদে স্থান পেয়েছে। এই অভিযোগের কারণেই তাদের ঘরের মহিলাদের ধর্ষিত পর্যন্ত হতে হয়। লোধারা যুগ যুগ ধরে জানত যে জঙ্গল তাদের। জঙ্গল তাদের মা। আর তারা এই মায়ের সন্তান। সে জঙ্গলে তারা মায়ের পরশে এক সময় সুখে ছিল। কিন্তু লোধারা আজ আর কুশলে নেই। জঙ্গল তাদের মা হলেও জঙ্গলের অধিকার আজ রাজবাহাদুরের। লোধারা আর বলতে পারে না যে "বনে জনম, বনে মরণ, বন লোধাদের হকের ধন।"[৪৯] তাই বনের সামগ্রী বাড়ি নিয়ে এলে তাদের পরিণাম এখন হাজতবাস। তাই আজ

লোধারা চোর বটে। অন্যান্য জনজাতির মতো তাদের জমিজমা নেই। অন্যের জমিতেই তাদের চাষ করতে হয়।

'শবর চরিত' এর বর্ণনায় অজস্র ছড়া, প্রবাদ, লোকসংগীত, মিথ, কিংবদন্তি, রূপকথা প্রভৃতি বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তাদের বিষয়গত দিক লক্ষ করলে দেখা যাবে তা বৈচিত্র্যপূর্ণ। উপন্যাসটির পটভূমি দেখলে তার ভৌগোলিক অবস্থানকে চিহ্নিত করা যায়। কিংবদন্তি অনুযায়ী রামায়ণের তপোবন এই অঞ্চল। এখানেই সীতাকে নির্বাসন করেছিল রাম। লব-কুশের জন্মও এখানেই। আর আমরা জানি, এইরকম প্রচলিত কাহিনিই মিথের জন্ম দেয়। 'শবর চরিত' এর স্রষ্টা নলিনী বেরা এক সাক্ষাৎকারে তাই বলেন—

"যে–অঞ্চলে জন্মেছি সে-অঞ্চলটা 'পুরাভূমির অন্তর্গত। 'পুরাভূমি' সেই ভূমি যে ভূমি সৃষ্টির কালে হিমালয়েরও সৃষ্টি হয়নি। হিমালয় তখনও টেথিস সাগরে ডুবেছিল। তার আগেই তৈরি হয়ে গেছে ছোটনাগপুরেরে মালভূমি। উত্তর কোয়েল, দক্ষিণ কোয়েল, অজয়, দামোদর, সুবর্ণরেখা। এইসব নামতো আর সেকালে ছিল না, তাছাড়া ভূমিকম্পনের ফলে বারবার মাটি চাপা পড়ে নদীঘাত উলটে গেছে, মাটি চাপা পড়েছে ; আবার উঠেছে। এখানকার আদিবাসী সাঁওতাল বিরহড়-লোধা-ভূমিজরাও কম প্রাচীন নয়। আমাদের গ্রামের অনতিদূরেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথিত 'তপোবন' বা বাল্মীকি মুনির আশ্রম আছে, যেখানে লব-কুশ জন্মেছেন। সীতানালা খাল আছে, যে খালের উৎসমূলে পোয়াতি সীতা হলুদ মেখে স্নান করেছেন, সে-জল এখনও হলুদ। শাল দাঁতন দিয়ে দাঁত মেজেছেন দাঁতনটা চিরে দু'ভাগ করে তাই দিয়ে জিভ ছুলেছেন। সেই চেরা দাঁতন থেকে দু-দুটো মহীরুহ শালগাছ জন্মেছে, সে গাছ এখনও আছে। আছে তাড়কারাক্ষসীর হাড়, আছে হনুমান চৌকি। . . . 'মিথ্' 'কিংবদন্তী' আমার আজন্ম শোনা, সেই কোন্ ছোটবেলা থেকেই। তার উপর ছিল আমাদের বাবা-কাকাদের মা-কিংবদন্তীর উপর কিংবদন্তী।"[৫০]

এই সমস্ত পৌরাণিক বিষয় 'শবর চরিত' এর স্রষ্টার জানা, ফলে স্বাভাবিকভাবে উপন্যাসেও সেই বিষয় মাঝে মাঝে মধ্যে জেগে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। আর যে মাটি লোকসংস্কৃতির ভিত্তিভূমি, সেখানে তো অবশ্যই লোকসংস্কৃতি মূল আধার হবে— এটাই তো কাম্য। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিচিত্র বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি উপন্যাসে প্রয়োগ করে উপন্যাসের শিল্পগুণ অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন নলিনী বেরা।

উপন্যাসকে কেন্দ্র করে অনেক ধর্মীয় প্রবাদের প্রয়োগ দেখা গেছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রবাদও অপ্রতুল নয় উপন্যাসে। আবার মিথের ব্যবহারে ঔপন্যাসিক বেশ গভীর জীবন-দর্শনের পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসে 'লোধা'দের চাষবাস করতে না পারার প্রসঙ্গে একটি মিথের অবতারণা করা হয়। রাইবু তার বাবার কাছে জানতে চায়— ভূমিজ, সাঁওতাল, তাঁতি, মাহাতো সবার ভূমি আছে, কিন্তু লোধাদের চাষ বাসের জন্য জমি নেই কেন! এই প্রসঙ্গে তার বাবা বলে চাষবাস করার জন্য ভগবান লোধাদের বলদ, হাল দেয়—

"... দিয়ে বলল, জঙ্গল কেটে চাষের জমি তৈরি কর। ত জঙ্গল কাটতে কাটতে শবরের খিদা-তেষ্টা পায়। কী খায়, কী খায়—না হালের বলদটাকেই কেটে খেয়ে ফেলল। ... রাগে কাঁই শিবঠাকুর তখন অভিশাপ দিল, বনে জঙ্গলেই ঘুরে ঘুরে মরবি তোরা। তোদের কপালে চাষবাস নাই।"[৫১]

সেই থেকে তারা চাষ হারায়। আবার উপন্যাসে ছড়ার বেশ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার দেখা যায়। তার বিষয়ও ভিন্ন ভিন্ন। লোকসংগীতের প্রয়োগেও ঔপন্যাসিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাই উপন্যাসে হলদি মাখানোর গান যেমন পাওয়া যায়, তেমনি গ্রামীণ উৎসবে 'চাঙ নাচের' গানও শুনতে পাওয়া যায়। ঝুমুর গানও সেখান থেকে

বাদ পড়েনি। ঝুমুর গান মেদিনিপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার অতি পরিচিত লোকসংগীত। এই গান প্রেমের ছাড়াও অন্য বিষয়ের হতে পারে। ঝুমুরের প্রেমজাতীয় গানগুলি কিছুটা অন্ত্যজ শ্রেণির— কারণ প্রেমের মহত্তর ভাব এর মধ্যে খুব একটা থাকে না। এক অর্থে এই গান খুব খাঁটি, এর মধ্যে গোপনতার আড়াল খুব একটা থাকে না। এইভাবেই 'শবর চরিত' এর রূপকার ভিন্নতর সংস্কৃতিকে তুলে ধরে উপন্যাসের বিষয়-বৈচিত্র্যকে বজায় রাখলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তিতে সার্বিক বিশ্লেষণে দুটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়— এক, গবেষণার জন্য নির্বাচিত উপন্যাসগুলির বিষয়-বৈচিত্র্য দুই, নির্বাচিত উপন্যাসগুলি থেকে প্রাপ্ত বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির বিষয়-বৈচিত্র্য। প্রথমটির কারণ এ অধ্যায়ের সূচনাতেই বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির বিষয়-বৈচিত্র্যের কারণ স্বতন্ত্র ভৌগোলিক পরিবেশ, স্বতন্ত্র গোষ্ঠীজীবন, ভিন্ন আচার-বিচার, লোকবিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা, রীতি-নীতি। কাজেই জীবন-যাপনের স্বতন্ত্রতা থেকে উদ্ভূত যে সংস্কৃতি তার বিষয়ও স্বতন্ত্র এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ।

তথ্যসূত্র :

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', অষ্টম মুদ্রণ, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, এপ্রিল, ২০১৩, পৃ ৭-৮

২. গুণময় মান্না, 'বাঙলা উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, এপ্রিল, ১৯৯৫, পৃ ৬৯

৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', অষ্টম মুদ্রণ, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, এপ্রিল, ২০১৩, পৃ ৮

৪. তদেব, পৃ ০৯

৫. তদেব, পৃ ১৫

৬. তদেব, পৃ ১৬

৭. মনোজ বসু, 'জলজঙ্গল', ''ভূমিকা অংশ' লেখকের ভাষায়'', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, শ্রাবণ, ১৪১৫, পৃ ০৩

৮. মনোজ বসু, 'জলজঙ্গল', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, শ্রাবণ, ১৪১৫, পৃ ০৫

৯. ডক্টর মযহারুল ইসলাম, 'ফোকলোর : পরিচিত ও পঠন-পাঠন', প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ ৩৫

১০. মনোজ বসু, 'জলজঙ্গল',' প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, শ্রাবণ, ১৪১৫, পৃ ২০

১১. তদেব, পৃ ৪০

১২. তদেব

১৩. তদেব, পৃ ৪১

১৪. তদেব, পৃ ৬৭

১৫. তদেব

১৬. তদেব, পৃ ৭৫

১৭. আবু ইসহাক, 'সূর্য-দীঘল বাড়ী', চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন, এপ্রিল ২০১২, পৃ ৮-৯

১৮. তদেব, পৃ ১৮

১৯. তদেব, পৃ ২০

২০. তদেব, পৃ ৯৪

২১. সুবোধ চৌধুরী, ‘খাঁটি সোনা তাই ভেঙ্গে গেল’, চতুর্থ দুনিয়া, ডিসেম্বর, ১৯৯৪, পৃ ১৪৪
২২. অরূপ কুমার দাস, (সম্পা.) ‘তিতাস একটি নদীর নাম জীবন সৃজন ও রূপায়ন’, দ্র. প্রভাস সামন্ত, ‘‘তিতাসের আখ্যানে ইতিহাসের অমোঘ সংক্রম’’, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৬, পৃ ১৩০
২৩. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, ‘তিতাস একতি নদীর নাম’, দ্বাবিংশ প্রকাশ, কলকাতা পুথিঘর, মাঘ ১৪১৫, পৃ ২১-২২
২৪. তদেব, পৃ ৩৩
২৫. অরূপ কুমার দাস (সম্পা), ‘তিতাস একটি নদীর নাম জীবন সৃজন ও রূপায়ন’, ‘‘তিতাসের কথাবৃত্তে লোকায়ত সংস্কৃতির জগৎ’’, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৬, পৃ ১২৯
২৬. সমরেশ বসু, ‘সমরেশ বসু রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড’, ‘গঙ্গা’, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, মার্চ ২০১২, পৃ ২২০
২৭. আব্দুল জব্বর, ‘ইলিশমারির চর’ পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ, কলকাতা, লেখা প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ ০৮
২৮. তদেব, পৃ ৯০
২৯. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, ‘মায়ামৃদঙ্গ’, ‘দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা অংশ’, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০০৪, পৃ ৮
৩০. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, ‘মায়ামৃদঙ্গ’, ‘তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা ; দে’জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০০৪, পৃ ১২
৩১. তদেব
৩২. তদেব পৃ ১৪
৩৩. তদেব পৃ ২৬
৩৪. তদেব পৃ ৪৪
৩৫. সাধন চট্টোপাধ্যায়, ‘সাধন চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র’ (প্রথম খণ্ড) ‘গহিন গাঙ’ প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১লা বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ ০৯
৩৬. তদেব পৃ ১৬
৩৭. তদেব পৃ ২০
৩৮. তদেব পৃ ২৪
৩৯. তদেব পৃ ১৬
৪০. তদেব পৃ ১৭

৪১. তদেব পৃ ১৪
৪২. অভিজিৎ সেন, ‘রহু চণ্ডালের হাড়’, প্রথম জে.এন.সি. সংস্করণ, কলকাতা, জে.এন.চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ ২১
৪৩. সম্পা মণ্ডল, ‘উপন্যাসের অপর কথার পর্বান্তর’, বুকস স্পেস, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০১৫, পৃ ১৯-২০
৪৪. অনিল ঘড়াই, ‘নুনবাড়ি’, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ ৩৪
৪৫. ভগীরথ মিশ্র, ‘আড়কাঠি’, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ ৩৪
৪৬. তদেব, পৃ ৩৫
৪৭. তদেব পৃ ১০৮
৪৮. নলিনী বেরা, ‘শবর চরিত’, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, করুণা প্রকাশণী, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ ৫৮
৪৯. তদেব পৃ ৯৩
৫০. নলিনী বেরা, ‘লিখিত সাক্ষাৎকার : বিষয় শবরচরিত’, ‘প্রিয়ংবদা’, ১৫ বর্ষ জানুয়ারি ২০০৭, পৃ ১০-১১
৫১. নলিনী বেরা, ‘শবর চরিত’, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ ৬৩